শ্রীমায়ের
দিব্য-জীবন ও সাধনা

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার

শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি
শ্রীঅরবিন্দ ভবন
৮, শেকসপিয়ার সরণি, কলিকাতা-৭১

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ১৯৫৩
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৫৫

প্রকাশক :
শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, পশ্চিম বাংলা
শ্রীঅরবিন্দ ভবন
৮, সেকস্‌পিয়ার সরণি, কলিকাতা-৭১

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ বুক
ডিস্ট্রিবিউসন এজেন্সি,
পণ্ডিচেরী-৬০৫০০২

প্রচ্ছদ :
ধর ব্রাদার্স
৬, রামমোহন রায় রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রণ :
শ্রীশান্তিময় ব্যানার্জী
প্রিণ্টার্স কর্নার প্রাঃ লিঃ
১, গঙ্গাধর বাবু লেন,
কলিকাতা-১২

উৎসর্গ
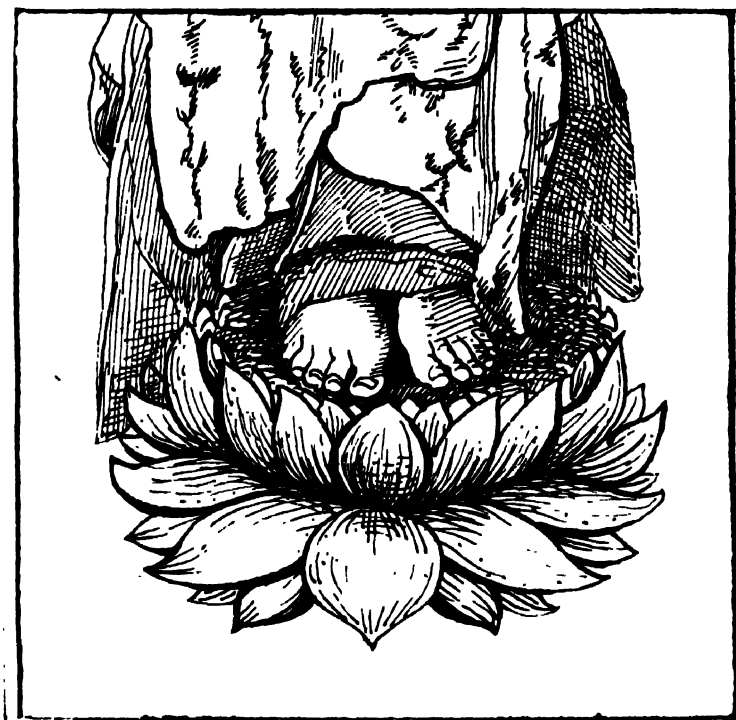
মা! গঙ্গা জলেই গঙ্গা পূজা হয়, তাই
তোমারই ফুল—অপটু হাতে সাজিয়ে
ধরে তোমারই রাতুল চরণে অর্পণ
করে ধন্য ও কৃতার্থ হ'লাম।

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন :

এই পুস্তক প্রণয়ণে নিম্ন বর্ণিত পুস্তক ও পত্র পত্রিকা সমূহ হতে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে : Life Divine, Synthesis of yoga, Words of Long Ago, ধ্যান ও প্রার্থনা, The Mother, শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী, সাদা গোলাপের গুচ্ছ, মায়ের আলাপ, Japa, Aurobindo Came to me, স্মৃতির পাতা, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম জীবনকথা, Auroville Brochure, Bulletin of Physical Education, Mother India, পুরোধা প্রভৃতি।

শ্রীমায়ের দিব্য-জীবন ও সাধনা

প্রস্তাবনা

মায়ের ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ জীবনী আজও সংকলিত হয়নি—আর তার সংকলন সহজও নয়—কারণ মা তাঁর নিজের কথা, তাঁর জ্ঞান কর্ম-ভক্তি সমন্বয়ে অনন্য সাধনা, তাঁর বহি ও অন্তর্জীবনের অভিজ্ঞতারাজি কখনই প্রকাশ করেন না—তথাপি ছোটদের ক্লাসে তাদের প্রশ্নের উত্তরে অথবা গল্পের অবতারণায় মা নিজের সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে যেটুকু প্রকাশ করেছেন, তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-ভাণ্ডার "ধ্যান ও প্রার্থনায়" যে সকল লব্ধ জ্ঞান ও ভগবদ অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন পুস্তক ও সাময়িক পত্রে যা সব লিখেছেন, ভক্ত শিষ্যদের পত্রের উত্তরে যা সব উপদেশ দিয়েছেন, প্রশ্ন-উত্তরে তাঁর অমৃত কথায় যেটুকু প্রকাশ করেছেন—শ্রীঅরবিন্দের কথায় ও লেখায় তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে এবং ভক্তজনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ভিতর দিয়ে যে সব সত্যের উদ্ঘাটন হয়েছে - সেই সকলের ওপর ভিত্তি করেই তাঁর একটা ধারাবাহিক আলেখ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি—যদিও তাকে পূর্ণাঙ্গ জীবনী হয়ত বলা যায় না—তবুও যতটুকু হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে একমাত্র মায়েরই আশীর্বাদে—তাঁরই কাছে নিরন্তর প্রার্থনা জানিয়েছি এর সফলতার জন্যে।

শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের সাধনা পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মানব সত্তাকে তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। দেখিয়েছেন ব্রহ্মাণ্ডে যা আছে এই মানব দেহতেও তাই আছে। মানুষের দেহ, মন, প্রাণ, চৈত্য প্রভৃতি প্রত্যেকটিই এক একটি পৃথক সত্তা—প্রত্যেকটিরই নিজ নিজ ক্রিয়া, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য বর্তমান—এবং এই সকল সত্তার সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে পূর্ণ মানব সত্তা। শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমা বলেছেন—স্থূলভাবে গঠিত এই মানব সত্তা এক বিশৃঙ্খলা মাত্র—তার মধ্যে দিব্য শৃঙ্খলা আনতে হবে—এই প্রতিটি সত্তাকে অতিমানসের আলোকে রূপান্তরিত করতে হবে—জীবনকে দিব্য-জীবনে পরিণত করতে হবে—তাহলে দেহ হয়ে উঠবে দিব্য দেহ, প্রাণ হবে দিব্য প্রাণ. মন হবে দিব্য মন—আর এই পৃথিবী তখন হয়ে উঠবে স্বর্গরাজ্য—মানুষ হবে দেবমানব—আর তখনই হবে মানুষের জীবনে ভগবানের প্রকাশ।

শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমা এর পথেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন—তবে সেই পথ জগত ও কর্মধারা হতে বিচ্যুত হয়ে নয়, পরম মুক্তি ও নিষ্ক্রিয়তা সাধন করে নয়, পরন্তু, ঐ পথে প্রবেশের জন্য মানুষকে জগত ও তার ক্রিয়াবলীর সঙ্গে মিলিত হতে হবে—

তার ভিতরের দিব্য সত্তাকে জানতে হবে এবং তা নিজ নিজ জীবনে অভিব্যক্ত করতে হবে, বিশ্বাতীত মহত্ব জ্যোতিঃ ও মাধুর্যে চেতনাকে সত্য করে তুলতে হবে। মনময় জীবন হতে এক উচ্চতর অধ্যাত্ম চেতনায়, এক বৃহত্তর ও দিব্যতর সত্তায় জন্মলাভ করতে হবে—তবেই মানুষ পৃথিবীতে ভগবদ ইচ্ছা পূরণে সক্ষম হবে—কারণ শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের সাধনায় তাই-ই কাম্য, মুক্তিই একমাত্র লক্ষ্য নয়।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনার রূপকারই হচ্ছেন আমাদের শ্রীমা—মা-ই সেই সাধনা জগতের মানুষের উপলব্ধিতে এনেছেন। মা দেখিয়েছেন সংসারে সুন্দর-জীবন যাপনের প্রণালী, সংসারে শত কাজের মধ্যেও কেমনভাবে একমাত্র ভগবানকেই জীবনের ধ্রুবতারা করে নির্ভয়ে চলতে হয়, কেমনভাবে তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে হয়, চাইতে হয়, কিভাবে প্রার্থনা জানালে তবে তা ফলপ্রসূ হয়, কেমনভাবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায়। মা নিজের জীবনে এইসব করে তবে অপরকে তার পথ দেখিয়েছেন।

মা আরও দেখিয়েছেন ভগবানের নিকটে কেমনভাবে পরিপূর্ণ আত্ম নিবেদন করতে হয়, কেমন করে মানুষের সকল কাজকে দিব্য কাজে পরিণত করা যায়। কেমনভাবে পূর্ণ সমর্পণ করতে হয়। কি উপায়ে মানুষ সকল কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে উঠে দিব্য-জীবন যাপন করতে পারে। মায়ের এই সব কথাই এই বইতে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে।

মা ভগবতী, মানুষের দেহ-ধারণ করে আমাদের মধ্যে এসেছেন—মায়ের জীবন অপূর্ব, মায়ের ধ্যান তপস্যা অনন্য—দেশ কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে তা ব্যপ্ত হয়ে রয়েছে সর্বদেশে সর্বকালে। এবারের লীলায় মা সাধনা সঙ্গে নিয়েই এসেছেন—আর তা মায়ের এই ছিয়ানব্বই বৎসর বয়সেও অব্যহতভাবে চলেছে নিরন্তর ভগবদ অভিমুখে যেমন নদী দুর্বার স্রোতে বহমান সাগরের দিকে।

মায়ের জীবনের ঘটনাবলী, মায়ের প্রার্থনা, মায়ের সাধনা এতই মহীয়ান, এতই মনোমুগ্ধকর যে তার অভিনিবেশ মাত্রই নিয়ে আসে তন্ময়তা—পৌছে দেয় ভাবরাজ্যে—নিজের অজান্তে এনে উপস্থিত করে অনুভূতির উপলব্ধির স্বর্ণ দুয়ারে।

মায়ের বাণী অনুপ্রাণিত করে সকল সত্তা—অনুরণিত হয় তা সুপ্ত হৃদয় তন্ত্রীতে—স্পন্দন জাগায় সেখানে—মন ও চেতনার ঊর্ধায়নে অতিমানসের স্পর্শ অনুভব করায়।

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের সাধন ধারায় অলৌকিক কাজের বা ঘটনার কোনই

গুরুত্ব নেই—জাগতিক উন্নতির বা ব্যক্তিগত লাভালাভেরও কোন প্রশ্ন নেই সেখানে। হঠাৎ সিদ্ধিও তাঁরা চান না—সিদ্ধি অর্জন করতে হবে চেতনার রূপান্তর ঘটিয়ে—সাধকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও ভগবদশক্তির আনুকূল্যে। শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের অদৃশ্যশক্তি এই সাধন পথে শক্তি সঞ্চার করে—মানব জীবনের বিকাশের পথ প্রস্তুত করে।

মা আমাদের সত্যকার মা-ই—মাকে ধরে ওঠা খুব সহজ ও সরল। মায়ের কাছে সব আবদার অনুরোধ চলে—সবাই মায়ের সন্তান—শুধু মা মা বলে সমস্ত অন্তর দিয়ে ডাকলেই মা আসেন, পথ দেখান, কোলে তুলে নেন—এ সবই পরীক্ষিত সত্য।

আজ আমরা জগতের এক সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের সামনে দুটি মাত্র পথ—একটি হানাহানির পথ, যা জগদব্যাপী ঘটে চলেছে আর একটি হ'ল নবজীবনে উত্তরণের পথ—দিব্য জীবনে রূপান্তরিত হওয়ার পথ—যে পথের সন্ধান শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমা জগতের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁদের লক্ষ্য মানব চেতনার পরিবর্তন সাধন করে তাকে দিব্য চেতনায় রূপান্তরিত করা—বিশ্বমানবের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা।

ভারতের মহান ঋষি সেই কোন সুদূর অতীতে জগতের মানুষকে আশ্বাস দিয়ে ডেকে বলেছিলেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥"

অর্থাৎ, হে বিশ্বের সকল মানুষ তোমরা শোন, জান যে তোমারও অমৃতের সন্তান—দিব্যলোকের অধিবাসী তোমরা। আমি আঁধারের পারের সেই দিব্য পুরুষকে দেখেছি, জেনেছি—তিনি সূর্যের চেয়েও ভাস্বর—তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃ—তোমরাও তাঁকে অবলোকন কর।

শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমা-ও আজ বিশ্ববাসীকে পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে দিব্য জীবনে উত্তরণের জন্য ডেকে বলছেন—

"হে জগতের সকল অধিবাসী!—তোমরা শোন! তোমরাও সকলে অনন্ত শক্তির অধিকারী, বিবর্তনের পর্বে পর্বে আলোকের যে আরোহণ তারই বার্তাবহ তোমরা! এই পথে এস, শাশ্বত জ্যোতির আবাহন কর, দিব্য জীবনে উন্নীত হও, আপন অন্তরাত্মাকে অন্তরস্থ ভগবানের দিকে জাগ্রত কর—মানব-জীবনকে সার্থক

কর—জয় কর কাল আর মৃত্যু—শাশ্বত অমৃতময় জীবন গড়ে তোল—তোমাদের পার্থিব-জীবন হয়ে উঠুক ভগবদ জীবন।"

পি ৫৫৭, ব্লক এন্, নিউ-আলিপুর, শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার।
কলিকাতা-৫৩

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণের নিবেদন

"শ্রীমায়ের দিব্য-জীবন ও সাধনার" প্রথম সংস্করণ অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় এটাই প্রমাণিত হ'ল যে মায়ের অনন্য দিব্যজীবন ও সাধন কথা জানার জন্য সকলে কিরূপ আগ্রহী। বর্তমান সংস্করণের কোন কোন অধ্যায়ে কিছু কিছু নতুন সংযোজন করা হয়েছে এবং পরিশেষে নতুন অধ্যায় "মহাসমাধি" যুক্ত হয়েছে।

কলেবর বৃদ্ধি ব্যতীতও কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও যাতে শ্রীমায়ের মহান জীবনী ও সাধন ধারা অনুধাবন করা সকলের পক্ষেই সহজ লভ্য হয় সেই জন্যই এই সংস্করণের মূল্য সামান্যই বৃদ্ধি করা হ'ল।

এই পুস্তক পাঠে মায়ের জীবন ও সাধনা হ'তে অনুপ্রেরণা লাভ করলে ও তা অনুসরণ করতে সচেষ্ট হ'লে শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

পি ৫৫৭, ব্লক এন্, নিউ আলিপুর,
কলিকাত-৫৩ শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার।
দর্শন দিবস—এপ্রিল ১৯৭৫।

চার বছর বয়েসে শ্রীমা—১৮৮২

সাত বছর বয়েসে শ্রীমা—১৮৮৫

১

ভোরের আলো

"মা একই, তবে তিনি আমাদের সম্মুখে নানারূপে আবির্ভূতা, বহু তাঁর শক্তি ও মূর্তি, বহু তাঁর প্রকাশ ও বিভূতি—সকলে তাঁরই কাজ ব্রহ্মাণ্ডে করে চলে। যে অদ্বিতীয়াকে আমরা পূজা করি তিনি বিশ্ব সত্তার অধিষ্ঠাত্রী ভাগবতী চিৎশক্তি।"

সেই মায়ের কথাই বলব—যে মা আমার মা তোমার মা সকলের মা, জগতের মা—জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দেশ কাল পাত্র অভেদে জগতের সকল মানুষের মা-ই হচ্ছেন আমাদের শ্রীমা—যাঁকে কেউ ডাকে মা নামে, কেউ বলে মাদার, কেউ ডাকে মাতাজী, আবার কেউ বা আদর করে বলে ডুস্ ম্যার অর্থাৎ মিষ্টি মা—এমন সার্বজনীন ভগবতী মা আর কেউ কখন দেখেনি জগতে এর পূর্বে।

শ্রীঅরবিন্দের কথায়—"মা পরমেশ্বরের চৈতন্য ও শক্তি, নিজের যাবতীয় শক্তির বহু ঊর্ধে তিনি—তবে তাঁর গতিবিধির কিছু আমরা দেখতে ও অনুভব করতে পারি তাঁর বিশেষ বিগ্রহের ভিতর দিয়ে, আর যে নানা দেবীমূর্তি ধরে তিনি কৃপাভরে সৃষ্ট জীবের কাছে আপনাকে প্রকাশ করেছেন, তাদের কল্যাণে।"

আমাদের এই মা-ও সেই মা, যাঁর কথায় শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"মা জন্ম থেকেই মা। ভগবান যখন মানুষের মধ্যে আসেন তখন মানুষের রূপেই আসেন, তাই বলে তাঁর ভগবানত্ব ছেড়ে আসেন না, সবই থাকে, ক্রমে ক্রমে তার প্রকাশ হয়। আমাদের এই মা শিশুকাল থেকেই ছিলেন সকল মানুষের উপরে।"

সেই সব কথাই বলব ও লিখব—শুধু লেখার জন্যই লিখব তা নয়—মা'র কথা বলে আনন্দ, শুনিয়ে আনন্দ, তাই লিখব। মায়ের ছেলে মেয়েরা তো সবাই মায়ের কথা ভালই জানেন তবুও তা বলতে ভাল লাগে, শোনাতে ভাল লাগে—আরও জানতে ইচ্ছা করে, শুনতে ইচ্ছা করে—তাইতো বলা, তাইতো শোনা, তাইতো লেখা—এতে

মায়ের চেতনার স্পর্শ পাওয়া যায়। সেটা কি কম কথা? সে কি কম লাভ? মানসিক দিক থেকে তো বটেই—আধ্যাত্মিক ও পরমার্থিক দিক থেকেও তাতে ঘটে চেতনার উত্তরণ। যে মা'র স্পর্শ পেয়েছে, যে একক্ষণের জন্যও মায়ের সান্নিধ্য পেয়েছে, মা'র নিকট হতে অনুভূতি লাভ করেছে—তাকে হয়ত ততটা শোনাবার প্রয়োজন নেই কারণ সে তো সেই আবহাওয়ার পরশ নিয়েই এসেছে কিন্তু যাদের সে সৌভাগ্য হয়নি, তাদেরও তো মাকে জানতে হবে—তাদেরও তো মায়ের অমৃত কথা শুনতে হবে—মায়ের অনুপ্রেরণা লাভ করতে হবে—জীবনকে সুষমায় মণ্ডিত করতে হবে।

ছেলে মা'র কথা বলছে, ভাল করে গুছিয়ে বলতে পারছে কিনা সেটা প্রশ্ন নয়—বলায় আনন্দ ও সুখ তাই বলছে—আর এই লেখাও পড়তে হবে সেই দৃষ্টি নিয়ে—তা না হলে কোথায় ফ্রান্সের পারী সহরে যাঁর জন্ম, কেন তিনি কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেন অধ্যাত্ম ভারতে—শিশুকাল থেকেই কেন না জেনেও ভারতের অধ্যাত্ম জ্ঞানের প্রতি তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ জন্মাল?

এবারের লীলায় ভগবান জগতের সমস্ত মানুষের চেতনার উন্মীলনের পথ খুলে দেবেন তাইতো ভারতে জন্মেও শ্রীঅরবিন্দ শিশুকাল হ'তে ইউরোপীয় রীতি নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে এলেন—আর শ্রীমা ইউরোপে জন্মে ও সেই ভাব ধারায় মানুষ হয়েও শিশুকাল থেকে প্রাচ্যের অধ্যাত্ম জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেন—আর তাঁর কর্মক্ষেত্ররূপে অধ্যাত্ম ভারতকেই বেছে নিলেন। পূর্ব ও পশ্চিমের এই সম্মেলন—শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের যুগ্ম প্রচেষ্টারূপে সূচনা করল এক নূতন যুগের—নূতন উষার—যাকে বলা হ'ল অতিমানসের যুগ—দিব্য-জীবনের যুগ।

ভগবানের বিধানে দুই মহাচেতনা এক হয়ে ঋষি কথিত ঋত-চেতনা বা অতিমানস-চেতনাকে পৃথিবীর বুকে নামিয়ে এনে মানব চেতনার রূপান্তর সাধনের জন্য ব্রতী হলেন। এই কাজের জন্য

তৎকালীন ফরাসী ভারতের রাজধানী পণ্ডিচেরী—বা অগস্ত ঋষির পুরাকালের বেদপুরী, লীলাস্থান বলে সূক্ষ্ম জগতে চিহ্নিত হ'ল—সেইজন্য শ্রীঅরবিন্দ ঈশ্বর আদেশ পেলেন পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় নিতে—শ্রীমা-ও অন্তরে নির্দেশ পেলেন পণ্ডিচেরীতে এসে শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের—যোগ চক্রের নক্‌সা হ'ল তার উপলক্ষ্য মাত্র।

মা আসার পূর্বেই মা যে কে তা শ্রীঅরবিন্দের অন্তরাত্মা উপলব্ধি করেছেন—তাঁরই বর্ণনায় তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন মহাকাব্য "সাবিত্রি"—যেমন রাম না হতেই রামায়ণ; মা'র কথায় তিনি লিখলেন—

"তিনি এক স্বর্ণ সেতু অপূর্ব অনল,
পরম অজানার তিনি এক প্রজ্বলন্ত শিখা,
গভীর অন্তরের নীরবতায়
তিনি এক মহাশক্তি॥"

আমাদের মা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—ষড়ৈশ্বর্য নিয়েই মা জন্মেছেন। জগন্মাতার সকল শক্তি নিয়েই মা মানবীরূপে অবতীর্ণা—যোগ তপস্যা সঙ্গে নিয়েই তিনি এসেছেন।

ছোট বয়স থেকেই মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখলেই মা গম্ভীর হয়ে যেতেন—তাঁর এই ভাব দেখলে তাঁর মা ভাবিতা হতেন—একদিন না থাকতে পেরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে মীরাকে—"হ্যাঁরে তুই সব সময় এত গম্ভীর হয়ে থাকিস কেন বলতো? যেন এ জগতের সব বোঝাই তুই বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিস।" মেয়েও তেমনি গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন মা'র কথার, বললেন—"হ্যাঁ মা, তুমি ঠিকই বলেছ—এ জগতের সব দুঃখই আমাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে বলে আমার স্বভাব এমন গম্ভীর।"

মা ভাবলেন নিশ্চয়ই মেয়ের মাথা খারাপ হয়েছে—মা কিছুই বুঝতে পারতেন না। মেয়ের জন্য যে ছোট্ট চেয়ারটি মা তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন—মেয়ে সেটিতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর

সমাহিত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন—প্রায় বাহ্যজ্ঞান হারা হয়ে। মা দেখতেন সব—তিনি ছিলেন একান্ত বস্তুবাদী—মেয়ের ভিতরের ভাব তাঁর বোধে আসত না—ফলে প্রায়ই তাঁর নিকট হতে মেয়ের ওপর চাপত তিরস্কারের বোঝা।

প্যারিসের এক অভিজাত পরিবারে আমাদের মা মীরার জন্ম—পিতা ছিলেন ব্যাঙ্ক মালিক, শোনা যায় এঁরা বংশানুক্রমে ফরাসী দেশের মূল অধিবাসী নন্—প্রাচ্য দেশের শোণিত এঁদের ধমনীতে প্রবাহিত ছিল—বোধ হয় সেই জন্যই মা মীরা ছেলে বেলা হতেই তাঁর অজান্তে প্রাচ্য ভাবধারার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করতেন এবং প্রাচ্যের ভগবদভাব, সংবেদনশীল মন ও পবিত্রতা তাঁর ভিতরে ফুটে উঠ্‌তে থাকে।

শিশুকাল থেকেই মা মীরা অনুভব করতেন এক বিরাট চেতন-শক্তি তাঁকে ঘিরে আছে—দেখতেন মাথার ওপরে এক উজ্জ্বল আলোক—যদিও যোগ সাধনা বা ধ্যানের কোন ধারণাই তাঁর নিজের তখন ছিল না—কিন্তু তিনি সত্যই ধ্যান সমাহিত হয়ে থাকতেন ঐ ছোট্ট চেয়ারটিতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা।

পরবর্তীকালে শ্রীমা নিজেই বলেছেন—"চার বছর বয়স হতেই আমার যোগের আরম্ভ—মনে আছে আমার মা আমার জন্যে একটা ছোট্ট চেয়ার তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন—তাইতে বসেই আমি তন্ময় হয়ে যেতাম—তখন আমার মাথার মধ্যে এক উজ্জ্বল আলো এসে ঝড় বইয়ে দিত। আমি এসব কিছুই বুঝতাম না—আর ওসব বোঝার বয়সও তখন আমার নয়—কিন্তু আস্তে আস্তে মনে বোধ আসতে আরম্ভ করল জগতে এক বিরাট কাজ আমাকেই সম্পন্ন করতে হবে।"

মায়ের লেখাপড়া শেখার ইতিহাসও অদ্ভুত। সাত বছর বয়সের পূর্বে মার বর্ণ পরিচয়ই হয়নি—কেউ তাঁকে পারেনি পড়াতে। কিন্তু একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তাঁর দাদা তাঁকে একটা সাইনবোর্ড

দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কি লেখা আছে বল তো? মা পড়তেই জানতেন না—কি করে বলবেন? বললেন—পড়তে জানি না। দাদার তাতে কি ঠাট্টা! মা'র ভীষণ অপমান বোধ হ'ল—বাড়ী ফিরে এসেই মা বই নিয়ে বসলেন, অক্ষর পরিচয় হ'ল, এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াতে বিদ্যালয়ে পরের পর বছর প্রথম হয়েই তিনি উত্তীর্ণ হতে থাকলেন।

মায়ের ভিতরে যে এক মহাশক্তি বর্তমান ও সে যে সেখানে কাজ করছে এ সম্বন্ধে মা সচেতন ছিলেন—তার প্রমাণও পাওয়া যায় তাঁর সাত বছর বয়সের সময়। ঐ সময় তের বছর বয়সের একটা বদ্ ছেলে সব সময়ই মেয়েদের অপদার্থ প্রভৃতি বলে পরিহাস করত। একদিন আর না সহ্য করতে পেরে মা তাকে ধমক দিয়ে বললেন- চুপ! আর ঐ সব উচ্চারণ করবে না! সে ঐ কথা না শুনে ঠাট্টা করতে থাকল। বয়সে ও আকৃতিতে যদিও মা তার থেকে অনেক ছোট তা সত্বেও তিনি তাকে তৎক্ষণাৎ শূন্যে উঁচু করে তুলে ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন—এক বিরাট শক্তি তখন মায়ের ভিতরে নেমে এসেছে। পরবর্তীকালে মা জেনেছিলেন—যে শক্তি তাঁর ভিতরে নেমে এসেছিল ও শক্তি জুগিয়েছিল তা হচ্ছে মহাকালী শক্তি।

মায়ের এই মহাকালী শক্তির স্ফুরণ হয়েছিল আর একবার তাঁর ষোল বছর বয়সের সময়। ঐ সময় মা ছবি আঁকা শেখার জন্যে পারীর এক বিখ্যাত ষ্টুডিওতে যোগ দেন। পারীর ঐটি সব থেকে নাম করা ষ্টুডিও। সেখানে যারা শিক্ষার্থী ছিলেন মা-ই তাদের মধ্যে বয়সে সব থেকে ছোট ছিলেন। সবাই মাকে 'রহস্যময়ী' বলে সম্বোধন করত। যখনই তাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিবাদ বা গোলমাল হ'ত সবাই মা'র কাছে আসত তার সমাধানের জন্যে। তিনি তাদের মনের চিন্তাভাবনা বোধে আনতে পারতেন—কারণ অধিকাংশ সময়ই তিনি তাদের বাহ্য কথার উত্তর না দিয়ে তাদের মনের ভাবনার উত্তর দিতেন—তাতে অনেক সময় তারা খুব অস্বস্তিও

বোধ করত। তিনি একেবারে ভয়-শূন্য হয়েই সব সিদ্ধান্ত নিতেন—এমন কি যদি ঐ সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষও সংশ্লিষ্ট থাকতেন, তাহলেও তিনি পিছপাও হ'তেন না।

একবার মনিট্রেস্ হিসাবে নিযুক্ত একটি মেয়ে সেখানকার কর্ত্রী স্থানীয়া একজন বয়স্কা মহিলার বিরাগভাজন হ'ন—তিনি ঐ মেয়েটিকে বিদায় করতে চেয়েছিলেন। তখন সকলে মিলে এসে এই "রহস্যময়ীকেই" ধরল ওই বিষয়ের একটা নিষ্পত্তি করে দেবার জন্যে। মা ঐ মেয়েটির প্রতি সহানুভূতিশীল হলেন, কারণ সে ওই ষ্টুডিও হতে বিতাড়িত হ'লে তার শিল্পী জীবনের একেবারেই অবসান ঘটবে। এইবারে ঐ কর্ত্রী স্থানীয়া মহিলাকে একটি দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধা ছোট্ট বিজয়িনীর সম্মুখীন হতে হ'ল। প্রথমে মা যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—কিন্তু তা যখন কোন ক্রমে সফল হ'ল না, ঐ মহিলা যখন কোন কিছুতেই কান দিলেন না, তখন মা আবার মহাকালীর রূপ ধারণ করলেন—তাঁর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর হাত এত জোরে চেপে ধরলেন যে তাঁর মনে হ'ল হাতের হাড় পিশে গুঁড়ো হয়ে যাবে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই মনিট্রেসকে থাকার অনুমতি দিলেন। আবার একবার দেখা গেল মায়ের ভিতরে মহাকালী শক্তি নেমে এসেছে।

ছেলেবেলা থেকেই মায়ের স্বভাবের দিকে একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল এবং গাছপালা ও নির্জনতা মা ভালবাসতেন। পারী সহরের নিকটেই ফঁতে ব্লু নামে এক প্রাচীন ও বিখ্যাত বন আছে। একদিন মা ঐ বনে খেলা করতে গিয়েছিলেন—সেখানে তিনি এক খাড়া উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে গিয়ে পা হড়কে নীচে পড়তে থাকেন—সমস্ত পাহাড়ের গায়ে কাল কাল ধারাল পাথর ছড়িয়ে পড়ে ছিল। যেমনই তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন তেমনি তাঁর মনে হ'ল কে যেন তাঁকে কোলে ধরে নিয়ে আস্তে আস্তে নামিয়ে নিয়ে আসছে। মাটিতে পৌঁছেই তিনি নিজের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। সঙ্গী

সাথীরা সবাই হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে সবিস্ময়ে দেখল যে তিনি একেবারেই আঘাত পাননি—অক্ষতই আছেন।

মা সেই ছোট্ট কালে প্রায়ই সেই বনে এসে বিরাট বিরাট গাছের নীচে বসতেন। ঐ বিষয়ে মা নিজে বলেছেন—"আমার তখন বয়স বোধ হয় বার বছর—পারীর কাছাকাছি একটা বনে আমি প্রায়ই বেড়াতে যেতাম—দু'হাজার বছরেরও পুরানো অনেক গাছ সেখানে আছে—ঐ সব গাছের নীচে বসেই আমি তন্ময় হয়ে যেতাম—তাদের সঙ্গে যেন একটা অন্তরের যোগ স্থাপিত হয়ে যেত—আমার ও সেই গাছের চেতনা যেন এক হয়ে যেত। গাছের কাঠবিড়ালী ও পাখিরা আমার সামনে এসে বসত—আমার গায়ের ওপর দিয়ে ছুটো-ছুটি ক'রে খেলা করত।"

মা স্বভাবের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে যেতেন—কোন ভিন্ন চেতনা তাঁর আর থাকত না—গাছপালা উদ্ভিদের ভিতরের স্পন্দন তাঁর বোধে আসত—তাদের সুখ-দুঃখও তিনি অনুভব করতেন, জানতে পারতেন তারাও মানুষের মতই স্নেহ-প্রবণ—ঠিক মানুষের মতই তারা ভালবাসে—উদারতাও তাদের মধ্যে প্রচুর। একবার এক গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতেই মা বুঝতে পারলেন যে সে মাকে অনুযোগ করছে যে তাকে কাটা হবে—তা রদ করার জন্যে সে যেন মাকে বলছে। মা'র চেতনা পশুপাখী গাছপালা সবার সঙ্গে এক হয়ে যেত—এজন্য পশুপাখীরাও মাকে তাদের নিজেদের আত্মজ বলেই মনে করত আর সেইজন্যই তাঁর উপস্থিতিতে কোনরকম সঙ্কোচ বোধ করত না—তাঁর ওপর দিয়েই ছুটোছুটি করে খেলা করে বেড়াত।

এগার বছর বয়সের সময়ই মা'র স্পষ্ট ভগবদ উপলব্ধি হয়—অবশ্য তার বহু পূর্ব হতেই তাঁর অনুভূতি আসতে থাকে—কিন্তু তা বোঝার বয়স তখনও মা'র হয়নি। এই সময় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই দিব্য অনুভূতি ও চেতনা তিনি লাভ করতে থাকেন এবং নিত্য ভগবদ উপস্থিতিও তাঁর বোধে [illegible] সম্ভব

সেই বিষয়ে ঐ বয়সেই তিনি নিশ্চয় হ'ন।

পরবর্তীকালে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রবর্তক পত্রিকায় মা লেখেন— "এগার ও তের বছরের মধ্যে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সমূহ আসতে থাকে যাতে করে শুধু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই নয়, পরন্তু, তাঁর সঙ্গে মানুষের মিলনের সম্ভাবনা— তাঁকে পূর্ণভাবে চেতনায় ও কাজে প্রকাশ ও এই পৃথিবীতে দিব্য জীবনে তাঁর প্রতীয়মানতা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হই। আমার ঘুমের মধ্যে ঐ সকল অভিজ্ঞতা আসতে থাকে ও সেই সকল পরিপূরণের উপায় সমূহও আমি ঐ ঘুমের মধ্যেই নানা গুরুর নিকট হ'তে পেতে থাকি—এবং তাঁদের কাউকে কাউকে আমি পরে এই পার্থিব জগতে দেখেছি…। পরে যেমন যেমন অন্তরের ও বাহিরের উন্নতি হতে থাকে তেমন তেমন আধ্যাত্মিক সম্পর্কও ওঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে। এবং যদিও ঐ সময় আমি ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম কিছুই জানতাম না—কে যেন আমাকে তাঁকে কৃষ্ণ বলে ভাবতে শেখাল…যে মুহূর্তে আমি শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছি, সেইক্ষণেই তাঁকে চিনতে পেরেছি—সেই পরিচিত ব্যক্তি যাঁকে আমি কৃষ্ণ বলে ডাকি…।"

তের বছর বয়সের সময় মা একবছর ধরে রোজ রাত্রেই ঘুমের ভিতরে এক স্বপ্ন দেখতেন—সেই স্বপ্নের কথায় মা তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন—"শৈশবে তের বছর বয়সে, প্রায় এক বৎসর প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি নিদ্রিত হওয়া মাত্রই আমার মনে হোত আমি যেন শরীরের বাহিরে এসে সোজা উপরে উঠে চলেছি—বাড়ী ছাড়িয়ে, সহর অতিক্রম করে, বহু উর্ধে। দেখতাম যেন আমি আমার চেয়েও দীর্ঘতর একটি অপূর্ব সুন্দর সোনার পোষাক পরেছি। যতই আমি উর্ধে উঠতাম, এই পোষাকটিও ততই দীর্ঘ হতে থাকত এবং আমার চারিপাশে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ত সহরটির উপর একটি বৃহৎ আচ্ছাদন রচনা ক'রে। তারপর আমি দেখতাম চারদিক থেকে লোকেরা আসছে—আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা—অসুস্থ ও অসুখী। তারা

সেই প্রসারিত পরিচ্ছদটির নীচে সমবেত হোত, তাদের দুঃখ দুর্দশা ও বেদনার কথা বলে সাহায্য ভিক্ষা করত। প্রত্যুত্তরে সেই নমনীয় পোষাকটি দীর্ঘ হয়ে তাদের প্রত্যেকের দিকেই যেত ও তাদের স্পর্শ করা মাত্র তারা সান্ত্বনা পেত, সুস্থ হয়ে উঠত এবং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সুখী ও সবল হয়ে তাদের শরীরের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করত।

আমার কাছে এর চেয়ে বেশী সুন্দর, এর চেয়ে অধিক আনন্দের আর কিছু ছিল না। রাত্রির এই কাজটি, যা আমার যথার্থ জীবন স্বরূপ ছিল—এর কাছে সকল কাজই নিরস, নিষ্প্রাণ মনে হ'ত। উর্ধে উঠে চলবার সময়ে প্রায়ই আমার বামপার্শ্বে একজন নীরব নির্বিচল বৃদ্ধকে দেখতে পেতাম, তিনি তাঁর শুভেচ্ছা ও স্নেহ নিয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করতেন; তাঁর উপস্থিতিই আমাকে উৎসাহ দিত। গাঢ় বেগুনী রংয়ের দীর্ঘ পোষাক পরিহিত এই বৃদ্ধটি ছিলেন—তিনি হলেন, অনেক পরে আমি জেনেছি, যাঁকে লোকেরা বলে—দুঃখের মানুষী বিগ্রহ।"

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দিব্য-জীবনে "প্রপঞ্চ বিভ্রম : মন, স্বপ্ন ও কুহক" অধ্যায়ে বলেছেন— "দিন হ'তে দিনান্তরে জাগ্রৎ চেতনার ধারাবাহিকতার মত স্বপ্নের মধ্যেও যদি একটা সঙ্গতি ও পরম্পরা থাকত, প্রত্যেক রাত্রিতে যদি বিগত রাত্রির স্বপ্নানুভবের অবিচ্ছেদ একটা অনুবৃত্তি চলত···তাহলে স্বপ্নকে আমরা দেখতাম অন্য চোখে।" —সেই জন্যই বলা যায়, যে সকল স্বপ্নের পারস্পরিক যোগসূত্র পাওয়া যায় তা নিশ্চয়ই হৃদয়ের গভীর স্তর হতে, এক বিশেষ চেতন ভূমি হতে, উৎসারিত হয়—১৩ বছরের মেয়ের পক্ষে অচেতনা, অবচেতনার উর্ধে উঠে, প্রাক-জ্যোতিঃ (subliminal) স্তরের ঐ চেতনায় আসীন হওয়া অধ্যাত্ম জগতের এক পরম বিস্ময়!

২

অধ্যাত্ম পিপাসা

"মা কেবল উপর হতেই বিশ্বের শাসন করেন না, তিনি এই নিম্নতর জগতেরও মধ্যে নেমে আসেন।...তিনি নেমে এসেছেন এখানে এই অজ্ঞানের মধ্যে, যাতে অজ্ঞানকে জ্যোতির দিকে নিয়ে যেতে পারেন, এসেছেন এই মিথ্যা ও প্রমাদের মধ্যে যাতে মিথ্যা ও প্রমাদকে সত্যে পরিণত করতে পারেন; এসেছেন এই মৃত্যুর মধ্যে যাতে মৃত্যুকে রূপান্তরিত করতে পারেন দেবোচিত জীবনে।"

—শ্রীঅরবিন্দ

এই তের বছর বয়সের মেয়েটীর বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকে আরও নিবিড়ভাবে জানার আগ্রহ বেড়ে চলে—অনুসন্ধিৎসু মন অধ্যাত্ম জীবনের সন্ধানে ফেরে—ভগবানের প্রতি আকুল নিবেদন মূর্ত হয়ে ওঠে, রূপ গ্রহণ করতে থাকে নিভৃতে সকলের চোখের অন্তরালে—চেতনার রূপান্তরও ঘটতে থাকে আর সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক অনুভূতি সমূহ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই প্রকাশ পেতে থাকে।

অধ্যাত্ম পিপাসু কয়েকজনের একটি ছোট্ট দল গড়ে উঠল প্যারিস সহরে আস্তে আস্তে—ভাগবত কথার আলোচনায় ও আত্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা মিলিত হতেন মধ্যে মধ্যে—শ্রীমা-ই ছিলেন সেই দলের প্রাণস্বরূপা নেত্রী—তাঁরই উপদেশ নির্দেশে চলতেন সকলে। শ্রীমায়ের প্রাণস্পর্শী ভাব ও কথায়, ভগবদভাবে বিভাবিত হতেন সবাই—অন্তরে মধুক্ষরণ হ'ত। পরস্পরের গভীরতম ভাব, চিন্তাধারা ও উপলব্ধির আদান প্রদান চলতে থাকে—জীবনের পূর্ণ আদর্শ রূপায়ণের দিকে এগিয়ে চলেন তাঁরা। ক্রমে ক্রমে তাঁদের প্রভাবের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে—দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে দূর দূরান্তরে নানাদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে—নানাস্থান হতে অনুপ্রেরণা লাভের জন্য আসতে থাকেন অধ্যাত্ম পিপাসু মানুষ।

প্রত্যেক বৈঠকে অধ্যাত্ম বিষয়ের আলোচনার শেষের দিকে প্রতিবারই একটি করে প্রশ্ন তুলে ধরা হোত সবার সামনে এবং

প্রত্যেককে তার নিজের ভাব ও অধ্যাত্ম উপলব্ধির আলোকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'ত। শ্রীমায়ের সেই কালের মানসিক গতি ও অধ্যাত্ম সম্পদের পরিচয়ের সন্ধান সেই সকল প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে কিছু কিছু পাওয়া যায়।

এমনি এক আলোচনা বৈঠকে—"বিশ্বব্যাপী কর্মৈষণার মাঝে মানুষের স্থান" এই প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন—"...আমরা প্রত্যেকেই ভগবদ শক্তির এক এক বিশেষ প্রকাশ। কাজ যতই সামান্য হোক, সেই কর্ম যজ্ঞে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে সম্পূর্ণভাবে—দেখব নিজের প্রবণতা, পক্ষপাত—উপলব্ধির বিশ্লেষণ করব এবং গর্ব অহঙ্কার অতিবিনয় বর্জন করে ও পরমতাপেক্ষী না হয়ে তা সম্পূর্ণ করব। যেমন ভাবে লোকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, যেমন ভাবে ফুল সুগন্ধ ছড়ায় সেরূপ স্বাভাবিক ভাবেই আমি তা করে যাব—কারণ অন্য কিছু করা হবে প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

যদি এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের অহমাত্মক বাসনা, ব্যক্তিগত স্বার্থ দূর করতে পারি তাহলে তখনই নিজেদের অন্তরের প্রবাহের ও গভীর প্রেরণার মাঝে পৌঁছিতে পারব—আর তার ফলে আমরা সক্ষম হব নিখিল বিশ্বের ক্রম বর্ধমান প্রাণবন্ত যে সকল শক্তি আছে তাদের সাথে এক হতে।

আমরা যদি আরও জ্ঞানের জন্য, অধিকতর বিচক্ষণতার জন্য ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য প্রবল আস্পৃহা পোষণ করি—তাহলে আমরা আমাদের ভিতরে এক শান্ত আভ্যন্তরীণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারব—যা আমাদের পূর্ণতা পেতে সত্যকারের সহায়ক হবে। আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় কথার চেয়ে কাজ হয় অনেক বেশী।"

এমনি সব প্রশ্ন উত্তরের ভিতর দিয়ে মা আর একদিন বললেন—"তোমার সত্তার মধ্যে প্রকৃত চৈত্য জীবনই হচ্ছে এক আনন্দময় প্রশান্তি—দুঃখ কষ্ট যেরূপই হোক না কেন—তা আমাদের দুর্বল স্থানগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—আর সেইজন্যই

সেখানেই আমাদের অধ্যাত্ম প্রচেষ্টা বেশী করে পরিচালনা করতে হবে।”

এই দলটির আদর্শ ও দর্শন, তাঁদের প্রকাশিত পুস্তক সমূহের মাধ্যমে ইউরোপের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় রাশিয়ার বিপ্লব আন্দোলনে সক্রিয় একদল যুবক ব্যর্থতায় অবসন্ন—পথের সন্ধানে দিশেহারা—তারা পড়লেন এদের দার্শনিক মতবাদ—দেখলেন ঐ মতবাদ শুধু তত্ব কথাতেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রকৃত কর্মেরও স্থান রয়েছে সেখানে—আকৃষ্ট হলেন তারা—কিভ সহর হতে তারা পাঠালেন তাদের এক প্রতিনিধিকে ১৯০৭ সনের জানুয়ারী মাসে পারীতে এই দলটির সাথে আলাপ আলোচনার জন্যে।

আগন্তুক ধীর শ্রান্ত কণ্ঠে জানালেন—যারা ঐ আন্দোলনের মধ্য-মণি—নেতা, তাদের অনেকেই হয় নিহত আর না হয় নির্বাসিত—তিনি বল্লেন এখন প্রশ্ন উঠেছে আমরা ঠিক পথে চলেছি কিনা—হিংসাকে আরও হিংসার দ্বারা—ধ্বংসকে আরও ধ্বংসের মাধ্যমে প্রতিহত করা ঠিক পথ কিনা?

এই দলের মুখপাত্র হিসাবে শ্রীমা বললেন—তোমাদের যা আদর্শ তা হিংসার দ্বারা সাধিত হতে পারে না। অবিচারের সাহায্যে কি ভাবে সুবিচারের প্রত্যাশা কর? এ পথ ছাড়, পশ্চাতে সরে যাও—নীরবে নিজেদের প্রস্তুত করে তোল, সকলে একত্র হও, আরও অধিকতর ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হও যাতে করে সুদিন এলে নিজেদের আত্মশক্তির সাহায্যে জয়যুক্ত হতে পার—যাতে হিংসার পথের পরাজয়ের গ্লানি আর বহন করতে না হয়। বিরোধী পক্ষের হাতে অস্ত্র তুলে দিও না, তাদের দেখাও তোমাদের ধৈর্য ও সাহস, ন্যায় ও সত্য—তোমাদের জয় নিকট হবে কারণ সত্য তোমাদের দিকে—শুধু আদর্শের দিক দিয়েই নয়, কাজের দিক থেকেও।

আগন্তুক অভিভূত—সকরুণ চোখ তুলে চাইলেন শ্রীমায়ের দিকে—যে চোখে আত্ম-প্রত্যয়ের ভাব ফুটে উঠেছে—পথের দিশা সে

পেয়েছে। বিদায় বাণীতে সে বলল—খুব আনন্দ পেলাম আপনাদের দেখা পেয়ে, কথা শুনে—যাদের কাছে মনের কথা বলা যায়—যাদের ন্যায়ের আদর্শ আমাদেরই মতন—যারা আমাদের উন্মাদ ভাবে না—বিদায়!

মায়ের চেতনার পরিধি বাড়তে থাকে—ধ্যান তপস্যায় মা তন্ময়—নিত্য নবজ্ঞান ও অনুভূতিতে মা ভরপুর—মা যখন তাঁর পিয়ানোতে মন প্রাণ বিমোহন ঝঙ্কার তুলে নিবিড় অনুরাগে অপূর্ব ছন্দে তাঁর প্রেমাস্পদের নিকট নিবেদন করেন তাঁর পরিপূর্ণ সমর্পণ তখন সুরের ব্যঞ্জনায় আকাশ বাতাস হয় উছলিত—ভাবের মূর্চ্ছনায়, তরঙ্গের আঘাতে মুখরিত হয়ে ওঠে নিখিল বিশ্ব—বনের পশু, বিহঙ্গ পর্যন্ত স্তব্ধ নিশ্বাসে আকর্ণ হয়ে শোনে সে সুর নির্ঝর।

উনিশ-শ শতকের প্রথম দিকে মা এসেছেন উত্তর আলজিরিয়ার ক্লেমসন সহরে বিশিষ্ট পোলিশ অতীন্দ্রিয় সাধক (Occultist) মসিয়ে তেঁও ও তাঁর আরও অভিজ্ঞা ফরাসী স্ত্রীর নিকট হতে ঐ গুপ্ত বিদ্যা আহরণের উদ্দেশ্যে—সেই যাত্রায় এমনই এক দিনে মা পিয়ানোতে সুরের ঝঙ্কার তুলে পুরো একটা সিম্ফোনি বাজিয়ে যেমনই থেমেছেন, অমনি কানে এল একটা শব্দ—কোয়াক! কোয়াক!!—মা মুখ তুলে চাইতেই দেখেন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক মস্ত কোলা ব্যাঙ—মায়ের দিকে তাকিয়ে বড় বড় চোখদুটি বিস্ফারিত করে বলছে—"কোয়াক!" মা তার ভাষা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, সে বলছে—"আবার বাজাও।" মা যেমন পিয়ানোতে সুরের রেশ তুলে বাজাতে আরম্ভ করলেন সেও সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল। ঐ ঘটনা সেখানে প্রায়ই ঘটত—মা বাজাতে সুরু করলেই কোলা ব্যাঙটা এসে দাঁড়াবে, আর বাজনা থামলেই "কোয়াক" বলে আবার বাজাতে বলবে। সুরের এই ব্যঞ্জনা—এই অমৃত ঝঙ্কার স্বর্গীয়—মায়ের অন্তরের প্রার্থনা, মায়ের পরমের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন সুরের রূপে ছড়িয়ে

পড়ে আকাশে বাতাসে—আকুল করে সর্ব জীব, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলকে।

আর একদিনের ঘটনা বলছেন মা—"গ্রীষ্মকালে আলজিরিয়ায় ভীষণ গরম—দক্ষিণেই সাহারা মরুভূমি—সে গরম অসহ্য—তেঁও-এর নিকট অতীন্দ্রিয় বিদ্যা শিখছি তখন আমি। প্রত্যহ দুপুরে সেই প্রচণ্ড গরমে আমি প্রকাণ্ড এক অলিভ গাছের তলায় গিয়ে বসে ধ্যান করতাম—একদিন যথারীতি দুপুরে গিয়ে ওখানে ধ্যানে বসেছি—গভীর ধ্যানে তন্ময় হয়ে গেছি—সেই অবস্থায় হঠাৎ আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। চোখ তুলে দেখি ঠিক সামনে তিন চার হাত দূরে এক মস্ত গোখরো সাপ ফণা তুলে এক একবার আমার দিকে এগিয়ে আসছে আর হিস্ হিস্ শব্দ করছে। আমি প্রথমটা বুঝতে পারিনি আমার ওপর তার কেন এত রাগ। হঠাৎ খেয়াল হ'ল আমি তার গর্তটা বন্ধ করে বসে আছি। কিন্তু তখন আর উপায় নেই, নড়লেই সে ছোবল মারবে। কিন্তু আমি ভয় পাইনি—অধীরও হইনি—ওর চোখের দিকে চোখ রেখে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে থেকে আমার শক্তি প্রয়োগ করতে থাকলাম—আস্তে আস্তে সেই বিষধর সাপ কাবু হতে হতে ফণা নামিয়ে সেখান হতে সরে পিছন ফিরে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তেঁও বললেন ও সাপটা ওখানে থাকে—স্নান করে এসে ও ঘরে ঢুকতে চাইছিল কিন্তু তুমি ওর রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিলে তাই ও রেগে উঠেছিল।"

অতীন্দ্রিয় (occultism) বিদ্যা শেখার জন্যে মা দুবার আলজিরিয়াতে আসেন ও তা শিখতে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন।

তেঁও ও তাঁর স্ত্রীর নির্দেশে মা তাঁর জড় দেহ সমাধিমগ্ন করে ক্রমপর্যায়ে সূক্ষ্মদেহে জেগে উঠতেন, আবার জড় দেহ ছেড়ে, সূক্ষ্ম দেহকেও ঘুম পাড়িয়ে—আরও গভীরতর স্তরে সেই একের মধ্যে সচেতন হয়ে উঠতেন। এইভাবে একের পর এক সব শৃঙ্গে আরোহণ করে—অতীন্দ্রিয়বাদীরা যাকে বলে অনৈসর্গিক স্তর—সেই স্তর

পৌঁছেছিলেন এবং ঐ বিদ্যার সকল নিয়ম, শক্তি ও পরিচালনা ক্ষমতা আয়ত্ব করেছিলেন, যাতে করে, ঐ বিদ্যায় আহৃত সকল জ্ঞান তিনি তাঁর অধ্যাত্ম আদর্শের রূপায়নে নিয়োজিত করতে পারেন।

তাঁর দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসা এত নিখুঁত হ'ত যে মনে হ'ত যেন তাঁর দেহের সাময়িক মৃত্যু ঘটেছে। এমনও হয়েছে যে আধার ত্যাগ করে এসে ভগবদ চেতনায় মিলে মিশে একেবারে এক হয়ে পরমানন্দে অবগাহন করেছেন—কিন্তু পৃথিবীর দুঃখ কষ্টের কথা স্মরণ করে তিনি সেই আনন্দময় অবস্থা ত্যাগ করেই চলে এসেছেন—বিশেষ কষ্ট করেই আবার দেহে প্রবেশ করেছেন—কারণ জড়দেহের সূক্ষ্ম সংযোগ সূত্র তখন প্রায় ছিন্নই হয়ে গিয়েছিল।

এই বিদ্যা সম্বন্ধে মা বলেছেন—"অতীন্দ্রিয় জগতের জ্ঞান—জড় জগত ও দেহের পাশাপাশি অবস্থিত সূক্ষ্ম জগত ও সূক্ষ্ম দেহের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। মনস্তাত্বিক পদ্ধতিতে একে বলা যায়—'চেতনার অবস্থা নিচয়', কিন্তু এই চেতন অবস্থাসমূহ সত্যই ভিন্ন ভিন্ন জগতের চেতন অবস্থা সমূহ। অতীন্দ্রিয় প্রক্রিয়ায় সেজন্য সত্তার ভিতরের বিভিন্ন স্তর ও সূক্ষ্ম দেহকে জানতে হবে, সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হবে—যাতে করে পরের পর তাদের প্রকাশ সম্ভব হয়। দেহ ছেড়ে বের হয়ে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ এবং অতীন্দ্রিয় প্রক্রিয়ায় ক্রম পর্যায়ে স্থূল হতে সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম হতে ইথারেব স্তরে মিলিয়ে যেতে হবে।

সজ্ঞানে নিজের জড় দেহ হতে বেরিয়ে এসে অপর কোন সূক্ষ্ম দেহে প্রবেশ—ইচ্ছা শক্তি পরিচালনা করে যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন—এই সকল সাধন করতে হলে সম্পূর্ণ ভয়শূন্য হতে হবে— অপরিমিত সাহস থাকতে হবে ভীষণ জীব বা পদার্থের সম্মুখীন হওয়ার—হ'তে হবে শান্ত সমাহিত—শৃঙ্খলা বোধও থাকতে হবে—কারণ এ জড়ের স্তরের বাহিরে অন্য এক স্তরের চেতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ বিদ্যায় গুরুর মন্ত্র ও

শক্তির সাহায্য সর্বদা প্রয়োজন—অন্যথায় এ আয়ত্ব করা সুকঠিন।"

অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞান—অদৃশ্য শক্তি ও তার নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞান। এর শিক্ষার্থীকে অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করতে হবে—সেখানে বহু ভয়াবহ জীব ও পদার্থ আছে—এখানে ভয় এলেই বিপদ—নির্ভয়ে থাকলেই নিরাপত্তা। দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে—দেহের সঙ্গে সংযোগ থাকবে শুধু একটা অদৃশ্য সূত্রের মাধ্যমে—যদি সূত্র ছিন্ন হয় তাহলেই সব শেষ—মৃত্যু।

মা বলেছেন,—"এই অন্য জগতে এসে তুমি প্রথমেই দেখবে ভয়সঙ্কুল দৃশ্য সমূহ। সাধারণ ভাবে মনে হবে তোমার চারিদিকে যেন আর বাতাস নেই—সব খালি হয়ে গেছে। আকাশ নীল ও সাদা সাদা মেঘ রৌদ্রে ঝলমল করছে কিন্তু যখন অন্য দিকটা দেখবে তখন দেখবে ছবি একবারে বদলে গেছে। দেখবে যেন সমস্ত আবহাওয়ায় সহস্র লক্ষ ছোট ছোট আকৃতির জীবে ভরে গেছে—যেগুলি হচ্ছে মানসিক বা প্রাণিক ইচ্ছায় গঠিত জীব সমূহ এবং মানসিক বিকলাঙ্গ সমূহ। তারা তোমার চারদিকে এমন ভিড় করে আসবে যে তা তোমার বিশেষ ভয়ের কারণ হয়ে উঠবে। কিন্তু তুমি যদি ভয় না পাও, যদি শান্ত আগ্রহার চোখ নিয়ে দেখ তাহলে ভয়ের তত কিছু থাকবে না।

বাস্তব জগতে যেমন, অতীন্দ্রিয় জগতেও ঠিক তেমনি প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে। অতীন্দ্রিয় বিদ্যাবলে যদি তুমি কোন কিছুর একটা মানসিক আকৃতি গঠন কর—যেমন, ধর যদি অপর একজনের কোন দুর্ঘটনা ঘটুক বলে তুমি মনে কর—আর যদি সেই ব্যক্তি তোমার অপেক্ষা অধিক চেতনযুক্ত হয়—তাহলে তখন ঐ আকৃতি তার কাছে যাবে—তাকে হয়ত স্পর্শও করবে কিন্তু ফিরে এসে দ্বিগুণ বেগে তোমাকেই আঘাত হানবে ও তুমি নিজেই দুর্ঘটনায় পড়বে। এই হচ্ছে ব্ল্যাক ম্যাজিকের ফল—যা হচ্ছে অতীন্দ্রিয় বিদ্যার এক নিকৃষ্টতম রূপ।"

মা যখন আলজিরিয়াতে তেঁও এর নিকট এই বিদ্যা শিখছিলেন তখন একদিন পারীতে তিনি তাঁর বন্ধুরা যেখানে গোল হয়ে বসে আলোচনা করছিলেন সেখানে, দেহ ছেড়ে বেরিয়ে এসে, উপস্থিত হ'ন ও পেন্সিল নিয়ে কয়েকটা কথা লেখেন। এই দিক দিয়ে তিনি আর বেশী অগ্রসর হ'ন নি। তাঁর ধ্যান, তাঁর সাধনা সব সময়ই অধ্যাত্ম সাধনার দিকেই অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে চলেছিল সকল মানবের কল্যাণের জন্য—পৃথিবীর রূপান্তরের প্রচেষ্টায়।

অতীন্দ্রিয় বিদ্যাবলে কি ভাবে মানুষের কল্যাণ সাধন করা যায় তা মার জীবনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে দুটি ঘটনায়—যা আমরা জানতে পেরেছি। প্রথমটি ঘটে আলজিরিয়া থেকে ফেরার সময়ে সমুদ্র পথে ও দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের জীবিতকালে ১৯২১ সনে।

প্রথম ঘটনাটী সম্পর্কে মা বলেছেন—"আলজিরিয়া থেকে যাত্রা করলাম, সঙ্গে তেঁও আসছিলেন ইউরোপ বেড়িয়ে যাবার জন্যে। জাহাজে সমুদ্র পথে আসতে আসতে প্রবল ঝড় উঠল—ক্যাপ্টেন বিব্রত বোধ করলেন—ভয়ে যাত্রীদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তেঁও আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তাহলে থামাও গিয়ে। তখন আমি কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লাম—তারপর নিজের দেহ ছেড়ে মুক্ত সমুদ্রের ওপর বিচরণ করতে লাগলাম—তখন দেখি অসংখ্য অশরীরী আত্মা সেই সমুদ্র তরঙ্গে পাগলামী করে বেড়াচ্ছে—তারাই দুষ্টামি করে জাহাজটাকে ধরে দোলা দিচ্ছে—আমি নম্রভাবে তাদের বুঝিয়ে বললাম……তারা শেষে তুষ্ট হয়ে নিবৃত্ত হ'ল। সমুদ্রের জল তখনই প্রশান্ত হয়ে গেল; আমি আবার দেহে ফিরে এলাম। তারপর বাইরে বেরিয়ে দেখি ঝড় থেমে গেছে—যাত্রীরা আনন্দে কোলাহল করছে।"

দ্বিতীয় ঘটনার স্থান পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। ১৯২১ সনের শীতকালে শ্রীঅরবিন্দ যে বাড়ীতে থাকতেন—সেখানে হঠাৎ

শূন্য হতে দিনের পর দিন ঢিল পড়তে আরম্ভ হ'ল। এ আরম্ভ হ'ত সন্ধ্যার সময় আর তা আধ ঘণ্টা ধরে অনবরত বর্ষণ হ'তে থাকত। দিনের পর দিন এ বেড়েই চলতে থাকল—ক্রমে বড় আকারের পাথরও পড়তে লাগল। প্রথমে, কোন কেউ এই হাঙ্গামা করছে ভেবে পুলিসে খবর দেওয়া হ'ল। পুলিস কাউকেই খুঁজে পেল না—কিন্তু তাদেরও গায়ে ইঁট পড়তে থাকায় তারা ভয়ে পালিয়ে গেল। শ্রীউপেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে সময় আন্দামান থেকে ফিরে এসে পণ্ডিচেরীতে অবস্থান করছেন—তিনি ভূতে বিশ্বাস করতেন না। লাঠি নিয়ে তিনি ছাদের ওপর উঠলেন—কিন্তু পাথর সমানেই পড়তে লাগল—শেষে তিনিও পালিয়ে এলেন। এই সমস্ত আক্রমণের লক্ষ্যই ছিল একটী বালক ভৃত্য—সে আহত হ'ল, রক্ত ঝরতে থাকল তার দেহ হতে। শ্রীঅরবিন্দ বললেন সব কথা মাকে জানাও—তিনি অকালটিস্‌ম্ (গুপ্তবিদ্যা) জানেন। মা সেই বালক ভৃত্যকে অন্য বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন—সেই সঙ্গে ঢিল পড়াও বন্ধ হল।

ব্যাপারটি হ'ল, এক পাচককে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়েছিল। সে এক ফকিরের নিকট হ'তে ব্ল্যাক ম্যাজিক শিখে ঐ কাজ করছিল। এ জানা গেল যখন ঐ পাচকের স্ত্রী ছুটে এসে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের পায়ে পড়ে করুণা ভিক্ষা করতে লাগল। তার স্বামী গুপ্ত বিদ্যার বলে দেখেছিল যে, সে যে শক্তি প্রয়োগ করছিল—তা শত গুণে বর্ধিত হয়ে ফিরে এসে তাকেই আক্রমণ করতে আসছে—তার মাথা উড়িয়ে দেবে এবং ইতিমধ্যে সে খুব অসুস্থও হয়ে পড়ল। দয়ার শরীর শ্রীঅরবিন্দের, তিনি ক্ষমা করলেন, বললেন—"এর জন্যে ওর মরার দরকার নেই।" সে সুস্থ হয়ে উঠল।

অতীন্দ্রিয় বিদ্যার কথায় শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—আধ্যাত্মিক অনুভূতিরই প্রথম প্রয়োজন—প্রথমে চৈত্যের ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তবে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান আহরণ করা সঙ্গত, অন্যথায় ঐ যাদু মন্ত্রের ফাঁদে পড়লে জীবনে আর বেরিয়ে এসে অধ্যাত্ম সাধনা

করা যাবে না। যার সত্যিকারের জ্ঞান লাভ হবে সে ভিতরের সত্যের শক্তিতে সকল প্রকার বাধা দূর করতে পারবে।

একমাত্র মায়ের মতন সমর্পিত প্রাণ উচ্চ সাধকের পক্ষেই সকল বাধা সকল প্রলোভন জয় করে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সত্যে পৌঁছান সম্ভব।

সেই কোন্ ছোট্ট বয়স হ'তে মা'র অন্তর থেকে নিবেদিত হয় প্রার্থনা তাঁর অন্তর দেবতার উদ্দেশে—উদ্গত হয় মন্ত্র পৃথিবীর কল্যাণে—শুধু নিজের কল্যাণ নয়, জাতির কল্যাণ নয়, জগতের সকল মানবের কল্যাণই মায়ের কাম্য। সেই কল্যাণ ব্রতের সাধনায় মা নিমগ্ন—তারই ফলশ্রুতি ও তপঃ শক্তির জন্যে মা পরিচিত হলেন অধ্যাত্ম পিপাসু নানা মত ও পথের লোকের সঙ্গে পারীতে, পরিচিত হলেন বাহা সম্প্রদায়ের নেতা আবদুল বাহার সঙ্গে। ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত বাহাউল্লার পুত্র—সুফী সম্প্রদায়ের চেয়ে এঁরা বেশী প্রগতিশীল বলে এবং আরও সংস্কার মুক্ত মতামত তিনি প্রচার করতেন বলে তাঁকে জেলে যেতে হয়। পিতার মৃত্যুর পর আবদুল বাহা তাঁরই মত্ প্রচারে ব্রতী হলেন পৃথিবীর নানা দেশে। এই মানুষটির ভেতরটি ছিল চমৎকার—তা ছিল যেমনি সরল, তেমনি ছিল তাঁর অন্তরের আস্পৃহাটিও অতি প্রখর। মা বললেন—"এই লোকটিকে আমার খুব ভাল লাগত—প্রথম যেদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনি কি ভগবানকে ভালবাসেন, তাঁকে মানেন? উত্তরে আমি বলেছিলাম, ভগবান বলতে আপনি ঠিক কি বলতে চান, তারই ওপর নির্ভর করে আমি কি মানি বা না মানি। অন্ততঃ আপনাদের ঐ সাম্প্রদায়িক ধারণা দিয়ে গড়া ভগবানকে আমার পছন্দ হয় না। তিনি স্বর্গে বসে আছেন, আর সেখান থেকে পৃথিবীর যত লোকদের পাপের শাস্তি বিধান করছেন, এ আমি বিশ্বাস করি না। ভদ্রলোক তো বিস্ময়ে একেবারে হত'বাক হয়ে গেলেন। তারপর আমাকে বললেন, বুঝেছি

আপনি হলেন জ্ঞান মার্গী। আমি যদিচ তাঁদের মতামত মানতাম না বা তা গ্রহণ করিনি, মানুষটিকে সত্যই আমার বড় ভাল লাগত। তাঁর ঐকান্তিকতা ও ভগবদ্ মুখী প্রেরণা ছিল অকৃত্রিম এবং সরল।

একদিন তিনিই আমাকে আশ্চর্য করলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, দেখি তিনি শুয়ে আছেন, অসুস্থ। সেইদিনই আবার তাঁর শিষ্যদের সভায় বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। কিন্তু উঠতেই পারছেন না—অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি যেতেই আমাকে বললেন, আজ আমার হয়ে আপনি ওদের সভায় গিয়ে বক্তৃতা দিন। শুনে আমি তো অবাক! বললাম, আমি আপনাদের সম্প্রদায়ের সভ্যও নই এবং ও সম্বন্ধে কিছু জানিও না, সুতরাং আমি ওখানে কি করে বক্তৃতা দেব? তিনি তা শুনলেন না, বললেন, তা হোক, সভায় গিয়ে খানিকটা চুপ করে শান্ত হয়ে থেকে, যা মনে আসে তাই বলে যাবেন, তাতেই কাজ হবে। অগত্যা তাই করতে হোল। আমি সভায় গিয়ে খানিকক্ষণ শান্ত হয়ে একাগ্রভাবে থেকে, সাধারণভাবে আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে বলতে লাগলাম। নিজের কানে শুনতে লাগলাম যা বলছি, অর্থাৎ কেউ যেন আমার মধ্য দিয়ে বলে যাচ্ছে এবং আমার মন নীরব শান্ত অবস্থায় নির্লিপ্ত হয়ে রয়েছে, তা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করলাম সেইদিন।*

পরে একদিন তিনি আমাকে বললেন যে আমি যেন প্যারীতেই থাকি ও তাঁর অবর্তমানে তাঁর অনুচরদের ভার নিই। কিন্তু আমি তাঁকে বললাম—আমি নিজেই তাঁর মতামত গ্রহণ করিনি সুতরাং তাঁর অনুচরদের ভার নেবার কথাই উঠতে পারে না। তিনি আরও বললেন—আপনি আমাদের সঙ্গে থাকলে প্যারিসের অর্ধেক লোক

*উপরে উল্লিখিত বক্তৃতার ঘটনা ও বিষ্ণুভাস্কর লেলের উপদেশে মনঃশূন্য হওয়ার পরে বোম্বাই সহরে শ্রীঅরবিন্দের বক্তৃতার ঘটনার সৌসাদৃশ্য বিস্ময়কর ভাবে লক্ষণীয়; দুটি বিভিন্ন আত্মা পৃথিবীর দুই প্রান্তে—ভবিষ্যত অতিমানস সাধনার যুগ্ম প্রস্তুতি হিসাবে একই ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে—সাধন ইতিহাসে এমনটি আর দেখা যায় না।

আমাদের দিকে চলে আসবে। আমি বললাম—আমার লক্ষ্য অর্ধেক প্যারিস নয়, আমার লক্ষ্য সমগ্র পৃথিবী।"

আর একটী উল্লেখজনক ঘটনা এর ভিতরে ঘটে গেল যাতে ক'রে শ্রীমায়ের ভবিষ্যৎ জীবন, কর্ম, সাধনা ও সিদ্ধির বিধি নির্দিষ্ট স্বর্ণপথ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

১৯১০ সনে শ্রীমায়ের স্বামী মঁসিয়ে পল রিশার প্যারিস হতে ভারতের পণ্ডিচেরীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন তাঁর নির্বাচনের কাজের জন্য। সেই সময় শ্রীমতী মীরা রিশার বা আমাদের শ্রীমা তাঁরই হাতে তুলে দিলেন এক যোগ চক্রের নক্সা—তাঁকে বললেন এর ব্যাখ্যা মিলতে পারে একমাত্র ভারতে—আর যিনি এর ব্যাখ্যা দেবেন তিনিই হবেন তাঁর যোগপথের সহায়—তাঁর উদ্দিষ্ট মহাপুরুষ। মঁশিয়ে রিশারও ছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনা ও চিন্তার অনুগামী—তিনি ঐ সনের মে মাসে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন লাভ করলেন ও তাঁর নিকট ঐ যোগচক্রের নিগূঢ় অর্থ জানতে চাইলেন।

শ্রীঅরবিন্দ পরিস্কার ভাবে বুঝিয়ে দিলেন তার অর্থ। যোগচক্রটি হ'ল সৎ-চিৎ-আনন্দের প্রতীক—প্রাণ, আলো ও প্রেমের আস্পৃহার প্রতীক—সৃষ্টির বৈচিত্র প্রবাহের প্রতীক—যার ভিতরের বিকসিত পদ্ম সূচনা করছে চেতনার উন্মীলন। আবার এই যোগচক্রই হ'ল শ্রীঅরবিন্দের প্রতীক ও সেই সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সাথে শ্রীমায়ের যোগসূত্রেরও প্রতীক।

এই সময় হতেই শ্রীমায়ের ভারতে আসার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে এবং ১৯১৪ সনে ভগবান তাঁকে ভারতে আসার—তথা শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের পরম আনন্দ প্রদান করেন।

সেই ১৯১০ হ'তে ১৯১৪ পর্যন্ত একদিকে ভারতে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের গভীরতম তপস্যা যেমন চেতনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে অতিমানসের সন্ধানে এগিয়ে চলে—তেমনই ইউরোপে ফ্রান্সে সমতানে মায়েরও গভীরতম সাধনা ঐ একই পথে ও উদ্দেশ্যে সমর্পণের

সব পর্য্যায় অতিক্রম করে নিজের জীবনে ও পার্থিব স্তরে ভগবদ্ প্রকাশকে স্থায়ী করার কাজে অগ্রসর হয়ে চলে উভয়েরই অজান্তে। ভগবানের অদৃশ্য ও অলঙ্ঘ্য বিধানে এই দুই মহাযোগীর—শিব ও শক্তির—মিলনের পথ প্রস্তুত হয় অভাবনীয় ভাবে সৎ-চিৎ-আনন্দের প্রতীক ঐ যোগ চক্রের নক্সাকে অবলম্বন করে।

৩

মায়ের সাধনার নবতম রূপ

"তোমার চিন্তা আমারই চিন্তা, তোমার কণ্ঠে আমিই কথা, আমার ইচ্ছা তোমারই ইচ্ছা, তুমি যা বরণ করেছ আমিও তাই বরণ করি। যা তুমি চেয়েছে তা সব আমি দিলাম পৃথিবীর মানুষকে।...আমার কালাতীত শক্তির আধার করে তুলব তোমায়..."

—সাবিত্রী

দিনের পর দিন মায়ের অন্তর ভরে উঠ্‌ছে নিত্য নবজ্ঞানে, আলোকে ও চেতনায়। প্রশান্তিতে মায়ের অন্তর ভরপুর— নিজেকে নিঃশেষে তাঁর পরমের কাছে নিবেদন করে মা পূর্ণ সমর্পণের পথে এগিয়ে চলেছেন, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মজ্ঞানে মায়ের চেতনা এখন সমৃদ্ধ।

১৯১২ সনের নভেম্বর মাস হতে মায়ের সাধন ধারা—মায়ের ধ্যান ও প্রার্থনা এক নবতমরূপে উদ্ভাসিত হতে থাকে। পরমের প্রতি মায়ের আকুল নিবেদন তাঁর নিজের মানস-পট ছাপিয়ে পূর্ণতম ছন্দ বৈচিত্রে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। একাগ্র সাধন অবস্থায় গভীরতম ধ্যানে উৎসারিত হয় মায়ের প্রার্থনা তাঁর অন্তরতম দেশ হতে— সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম সেই প্রার্থনারূপ স্পন্দনরশ্মি স্থূলবাস্তবে রূপ গ্রহণ করে ভাষার আখরে, ফুটে ওঠে তা মায়ের নিপুন হাতের লেখায়—রচিত হয় এক অভিনব নূতন সাধন গাথা ও সাহিত্য—ভাষায়, ছন্দে, লালিত্যে যা পৃথিবীর সর্বদেশের এক অনবদ্য সম্পদ—যা যুগে যুগে মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে, শক্তি দেবে আত্মজয়ের এবং সন্ধান দেবে ভগবানের দিকে চলবার ও ভাগবত কর্মে নিজেকে উৎসর্গ করবার পথের।

এই প্রার্থনা যে ভগবানের প্রতি নিবেদিত হয়েই রইল শুধু তাই নয়—ঐ সব প্রার্থনার উত্তরে মা তাঁর পরমের বাণীও শুনছেন। সেই বাণী ও সংলাপ মা ধরেছেন লেখনীমুখে তাঁর "ধ্যান ও প্রার্থনায়"। পরমের বেদীমূলে দিনের পর দিন উৎসর্গীকৃত এই ধ্যান ও প্রার্থনারাজি

সাধন জগতে এক পরম সম্পদ, এক পরম বিস্ময়, এক গভীরতম পরা চেতনার প্রস্ফুরণ।

মা নিজেই তাঁর লিখিত ধ্যানের হেতু ও সার্থকতার কথায় বলেছেন—

"আমার এই লিখিত ধ্যানের হেতু ও সার্থকতা এইখানে যে তা প্রতিদিন তোমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত।…প্রতিদিনই তাহলে এই রকমে তোমার সঙ্গে আমার প্রায়ই যে আলাপ হয় তার কিছু একটু স্থূলরূপ দিয়ে ধরতে পারব।"

মা তাঁর লক্ষ্যের কথায় তাঁর দৈনন্দিন প্রার্থনায় বলেছেন,—"যথাসাধ্য তোমার কাছে আমি সব খুলে বলব, এ বিশ্বাসে নয় যে তোমাকে নতুন কিছু বলতে পারব, তুমিইতো সব জিনিস….তাহলেও তোমার দিকে যখন ফিরে দাঁড়াব এসব জিনিস দেখবার সময় তোমার আলোকে নিজেকে যখন অভিষিক্ত করব—তখন দেখতে পাব ক্রমে তারা তাদের সত্যকার স্বরূপের মত হ'য়ে উঠেছে। একদিন শেষে আসবে, যেদিন তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক হ'য়ে যাব, তখন আর তোমাকে বলবার আমার কিছু থাকবে না, কারণ আমি তো তুমিই হ'য়ে যাব। ঠিক এই লক্ষ্যেইতো পৌছিতে চাই, ঠিক এই বিজয়ের দিকেইতো আমার সকল প্রয়াস আমি নিয়োগ করতে চাই। সেদিনের অপেক্ষায় রয়েছি যেদিন আমি আর 'আমি' বলতে পারব না, কারণ আমি হয়ে যাব 'তুমি'।"

মা তাঁর সাধনায় এগিয়ে চলেছেন—তাঁর প্রার্থনাও মূর্ত হয়ে উঠ্ছে, ১৯শে নভেম্বর মা বলছেন—"ভগবান তোমাকে আমি চিরতরে পেয়েছি…আমার সকল চিন্তা চলেছে তোমার দিকে, আমার সকল কর্ম তোমার দিকে উৎসর্গীকৃত।"

কিন্তু মা এততেও পূর্ণতা অনুভব করছেন না, তিনি বলছেন—"যদিও তোমার শান্তি আমার হৃদয়ে বিরাজমান তবুও আমি জানি এই যে মিলনের অবস্থা এও অকিঞ্চিৎকর অস্থায়ী, কাল যে অবস্থা আমার

অধিগত হবে তার তুলনায়।”

মায়ের মনে হয়েছে কর্মই সাধনা—কর্মই এনে দেয় ধারণ সামর্থ্য —যোগ সামর্থ্য। তাই মা ২৮শে নভেম্বরের ধ্যানে তাঁর পরম দয়িতকে জিজ্ঞাসা করছেন—“ধ্যানে ধারণায় যে সময় অতিবাহিত হয়, বাহ্য-জীবনের প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্তের কর্ম কি তার পরিপূরক নয়?… ধ্যান, ধারণা, ভগবদ্‌মিলন এ হ'ল লব্ধ ফল, পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল। আর দৈনন্দিন কর্ম হ'ল যেন কামারের হাতুড়ি, যার আঘাত পড়বে প্রতি অঙ্গের ওপরে যাতে তারা সুনম্য, শুদ্ধ, সংস্কৃত হয়—যাতে ধ্যানে যে জ্যোতিঃ এনে দেবে তার জন্যে যেন তার ধারণ-সামর্থ্য জন্মায়।”

মা হঠাৎ সিদ্ধি চান না—নিরাসক্তভাবে তিনি পায়ের পর পা এগিয়ে চলতে চান সাধনায়, ধ্যানে, তপস্যায়—তিনি তাঁর উপলব্ধি-তেও জেনেছেন—“হঠাৎ সিদ্ধি কখনও সর্বাঙ্গীন হতে পারে না—তাতে ঘটে একান্তপক্ষে সত্তার দিকপরিবর্তন…কিন্তু সত্য সত্য লক্ষ্যে পৌঁছিতে হ'লে সকল রকমের অভিজ্ঞতা না স্বীকার করে কোন উপায় নেই।”

মা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন তাঁর সকল কাজে সকল সাধনায়—আর তাতে ক্রমেই তিনি ভগবানের ওপর একান্ত নির্ভর হয়ে উঠ্‌ছেন। তিনি তাঁর পরম দয়িতকে ডেকে বলছেন—“কাল রাত্রে পরীক্ষা করলাম, তুমি যেমন চালাও তেমনি নির্ভর করে ছেড়ে দিলে কি সুফল তার হয়। যে জিনিস যখন জানা প্রয়োজন, তা ঠিক তখনই জানা যায়; তোমার জ্যোতির দিকে ফিরে মন যত নিশ্চল থাকে, সত্যের প্রয়োগও তার মধ্যে হয় তত সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট।”

মায়ের নির্ভরতা আরও নিবিড়, আর একান্ত, আরও পূর্ণতম হয়ে উঠ্‌ছে, মা তাঁর নিজের ইচ্ছা ভগবদ ইচ্ছায় নিঃশেষে মিশিয়ে দিয়ে তাঁর আকুল প্রার্থনায় ভগবানকে ডেকে বলছেন—“ভগবান্! শিখা যেমন জ্বলে নির্বাক হয়ে, সুবাস যেমন ঊর্ধে ওঠে নিষ্কম্প ভাবে, আমার ভালবাসাও তেমনি চলে তোমার দিকে। শিশু যেমন তর্ক করে না,

কিছুরই জন্য চিন্তা করে না, আমিও তেমনি তোমাতে নির্ভর করি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার আলো ফুটে উঠুক, তোমার শান্তি ছড়িয়ে পড়ুক, তোমার ভালবাসা জগত ছেয়ে দিক। তোমার ইচ্ছা যখন হবে, তোমার মধ্যে থাকব আমি অভিন্ন হয়ে—সেই শুভক্ষণের অপেক্ষায় আমি রয়েছি, কিন্তু কোন রকম অধীর না হয়ে, নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি অব্যর্থভাবে তারই দিকে বয়ে যেতে, প্রশান্ত নদী যেমন বয়ে যায় অপার সাগরের দিকে।"

আস্তে আস্তে মায়ের চেতনায় তাঁর পরমের বাণীর স্ফুরণ হতে থাকে—মা তাঁর অন্তর দেবতার বাণী শোনেন তাঁর অন্তরতম দেশে, তাঁর ধ্যান লিপিতে মা লিখলেন--"আমার ভিতরে তুমি কথা বলছ শুনতে পেলাম—ইচ্ছা হয়েছিল যা বলছ লেখায় যদি ধরে রাখা যেত যাতে যথাযথ বাক্য তোমার এতটুকুও নষ্ট না হয়; কারণ তুমি যা বলেছ এখন তা পুনরুক্তি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। পরে ভেবে দেখলাম এই ধরে রাখার স্পৃহা এও তোমার উপর নির্ভরতার অভাব।"

মা অপেক্ষমান—ভগবানের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনের অনেক বাধাই তাঁর অপসারিত হয়েছে, অবশিষ্ট যেটুকু আছে তাও দূর করার জন্যে মা স্থির নিশ্চয়—মা তাঁর একাগ্র ধ্যানে লিখছেন—"···ধীর স্থির হ'য়ে আমি অপেক্ষা করছি যাতে আর একটা আবরণ ছিন্ন হয়ে যায়, তোমার সঙ্গে মিলন হয় আরও সুসম্পূর্ণ। আমি জানি এই আবরণ গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটীর, অসংখ্য বন্ধনের সমষ্টি নিয়ে···।"

পৃথিবীতে এক নূতন যুগের আলো ফুটিয়ে তুলেছেন মা, তাঁর একাগ্র সাধনায় পৃথিবী রূপান্তরের দিকে এগিয়ে চলেছে—তার দুঃখের দিনের কষ্টের দিনের জন্য মার প্রার্থনার উত্তরে তাঁর মধুরতম ভগবান পৃথিবীকে আশ্বাস দিচ্ছেন—মা শুনছেন তাঁর পরম দয়িতের বাণী তাঁর গভীরতম অন্তরে। ভগবান পৃথিবীকে ডেকে বলছেন—"ওগো দুঃখিনী পৃথিবী, মনে রেখো তোমার অন্তরে আমিই রয়েছি, নিরাশ হয়ো না। তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যাথা, প্রত্যেক উল্লাস,

আর প্রত্যেক বেদনা, তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান, তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্খা, তোমার ঋতুচক্রের প্রত্যেক পুনরাবর্তন, সব জিনিস কোন কিছু বাদ না দিয়ে—তোমার কাছে যা দুঃখের মনে হয় আর যা সুখের মনে হয়, যা মনে হয় মলিন, আর যা মনে হয় সুন্দর—সকলে অনিবার্যভাবে তোমাকে নিয়ে চলেছে, আমারই দিকে—আমি অন্তহীন শান্তি, ছায়াহীন আলো, ছেদহীন সম্মিলন, একান্ত নিঃসংশয়তা, বিশ্রান্তি—পরম আশীর্বাদ।

শোন পৃথিবী ওই ফুটে উঠে অপরূপ কণ্ঠ ;
শোন আমার সাহসে ভর কর।"

মানুষের দুঃখ বেদনায়ও মা কাতর—তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য, সকলের সাহায্যের জন্য শক্তি চাইছেন ভগবানের নিকট—আকুল প্রার্থনায় ভগবানকে ডেকে বলছেন—"ভগবান! আগুন যেমন আলো ও উত্তাপ দেয়, ঝর্ণা যেমন তৃষ্ণা জুড়ায়, তরু যেমন ছায়া ও আশ্রয় প্রদান করে, আমি যেন সেই রকম হতে পারি…মানুষেরা বড় দুঃখী, এত অবোধ, তাদের সাহায্যের বড় প্রয়োজন।"

দেহকে বাদ দিয়ে, পূর্ণ ধ্যান সিদ্ধিকে মা পূর্ণতম প্রাপ্তি বলে স্বীকার করছেন না—শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই মা-ও আশ্চর্যভাবে চাইছেন দেহের, প্রাণের, মনের পূর্ণ রূপান্তর—পরমা সিদ্ধির জন্য পার্থিব চেতনার দ্রুত রূপান্তর। এরই জন্য মা তাঁর ধ্যানে ভগবানকে বলছেন—

"নীরবতার মধ্যে, একান্তের মধ্যে পূর্ণ ধ্যান সিদ্ধি হয়েছে যার, তারও সে অবস্থা লাভ হয়েছে দেহ থেকে নিজেকে পৃথক্ করে নিয়ে, দেহটাকে বিযুক্ত করে দিয়ে ; ফলে হয়, এই শরীর যে উপাদানে গঠিত তা ঠিক পূর্ববৎ অশুদ্ধ ও অপূর্ণই রয়ে যায় ; কারণ তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় নিজেকে নিয়ে নিজে পড়ে থাকতে। একটা ভ্রান্ত অধ্যাত্ম স্পৃহা, স্থূলাতীত ঐশ্বর্যের প্রতি আকর্ষণ…জড়ের শুদ্ধি ও রূপান্তর সাধনের যে ব্রত তা থেকে কাপুরুষের মত সরে দাঁড়ায়।…"

তিনমাস অনুপস্থিতির পর মা আবার ফিরে এসেছেন ভগবানের নামে উৎসর্গীকৃত তাঁর নিজের গৃহে—গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে মা'র মনে হয়েছে তখনও মা'র অহং যায়নি—তাই তিনি ভগবানকে ডেকে বলছেন—

"...আমার হাসি পায় যে কথা জানতাম না সে কথা জেনে, আমার হাসি পায় একথা মনে করে যে বাড়ী ছাড়বার পূর্ব পর্যন্ত আমার বোধে ছিল যে আমিই হ'লাম বাড়ীর কর্ত্রী। আমার অহং বোধ ভেঙে চুরে পিষে যাক চিরকালের তরে, এইতো ছিল প্রয়োজন যাতে আমি বুঝতে পারি, দেখতে পারি, অনুভব করতে পারি সব জিনিসকে তারা বস্তুতঃ যা সেইভাবে।...ভগবান! সবই তো তোমার জিনিস, তুমিই তো সব জিনিস আমাদের হাতে দিয়েছ ব্যবহারের জন্যে। কি অন্ধই না আমরা, মনে করি যখন আমরা কিছুর মালিক! আমি তো অতিথি মাত্র, এখানে যেমন সর্বত্রই তেমন, পৃথিবীর ওপর তোমার বার্তাবহ, তোমার সেবক।..."

মায়ের সাধনা তখন তুঙ্গে—নিরন্তর তা এগিয়ে চলেছে দুর্বার জলস্রোতের মত—দিব্য উপলব্ধিতে মা ভরপুর—অসীম অনন্ত বিশালতা মায়ের চেতনায়, তিনি ভগবানকে নিবেদন জানিয়ে বলছেন—

"আমার আধারে নূতন এক দুয়ার খুলেছে, এক বিশালতা এসে দেখা দিয়েছে, দরজা আমি পার হয়ে এসেছি নিষ্ঠা ভরে।"

মায়ের যে এতবড় সাধনা, অন্তর তাঁর জ্যোতির্ময়, সিদ্ধি করতলগত—তাও মা নিজেকে পূর্ণ বলে বোধ করছেন না—তিনি তাঁর প্রার্থনায় বলছেন—

"এ পথে চলবার মত উপযুক্ত ঠিক মনে করতে পারিনা নিজেকে এখনও। প্রচ্ছন্ন এ পথ, বাহ্য দৃষ্টির কাছে আবৃত, অন্তর তবে অদৃশ্যভাবে জ্যোতির্ময়।"

সব পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সবই নতুন। পুরানো ছিন্নবস্ত্র সব যেন খসে পড়েছে, নবজাত শিশু চোখ মেলে তাকিয়েছে উদীয়মান

ঊষার দিকে।"

মা চাইছেন সকল মানুষের কল্যাণ—সকলের চেতনার রূপান্তর। মা আত্মশক্তিতে ও বিশ্বাসে বলীয়ান—মা এখন নিশ্চিত যে যারাই মায়ের সংস্পর্শে আসবে মায়ের মধুরতম ভগবান তাদেরই নবজীবনে অভিষিক্ত করবেন—তিনি তাই ভগবানকে সম্বোধন করে বলছেন—

"হে ভগবান! আমি জানি সে দিন আসবে, আমি জানি একদিন আসবে যখন আমার কাছে যারাই উপস্থিত হবে তাদের সকলকে তুমি রূপান্তরিত করবে, এতখানি আমূল রূপান্তরিত করবে যে অতীতের সব বন্ধন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে তারা তোমার মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন জীবন যাপন করতে শুরু করবে…।"

মা তাঁর পরম দয়িত পরম ভগবানকে অশেষ শ্রদ্ধাভরে সকল মানবের পক্ষ হতে প্রশস্তি করে বলছেন—

"হে ভগবান!
তোমারই আলোকে আমাদের দৃষ্টি,
তোমারই চেতনায় আমাদের জ্ঞান,
তোমারই ইচ্ছায় আমাদের সিদ্ধি।"

৪

শ্রীঅরবিন্দ তীর্থ পরিক্রমায় শ্রীমা

"আলো চাই, স্বাতন্ত্র্য চাই, চাই অমৃতের অধিকার, চাই দিব্য-জীবনের ভাস্বর মহিমা—এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যেমন মানুষের যাত্রা শুরু তেমনি এর চরিতার্থতাতেই তার ইতি , এর চেয়ে বৃহত্তর কামনা তার মনেরও অগোচর।"

—দিব্যজীবন

১৯১৪ সন স্মরণীয় বছর। বহির্জগতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনায় বহিরঙ্গের একটা সার্বিক পরিবর্তনের যেমন সূচনা করেছে—তেমনি অন্তর্জগতেও শ্রীমায়ের শ্রীঅরবিন্দ দর্শন পার্থিব চেতনার রূপান্তর সাধনের পথ উন্মুক্ত করেছে।

এই আসন্ন ঘটনায় সূক্ষ্ম জগতের পরমা সিদ্ধির সম্ভাবনা যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে শ্রীমাও সচেতন। তিনি তাঁর চারিপাশের সবাইয়ের জন্য, সব কিছুর জন্য শুভকামনা ও প্রার্থনা জানিয়ে তাঁর ধ্যান লিপিতে লিখলেন—

"আমার যাত্রার দিন যত নিকটে আসছে তত আমি একটা শান্ত সমাহিত চেতনার মধ্যে প্রবেশ করছি। যে সব সহস্র তুচ্ছ জিনিস আমাদের ঘিরে রয়েছে, এত বছর ধরে যারা নীরবে আমার বিশ্বস্ত বন্ধুর কাজ করে এসেছে তাদের স্নেহ গম্ভীর দৃষ্টি দিয়ে আমি দেখছি। বাহিরে থেকে আমাদের জীবনের মধ্যে যে শ্রী তারা এনে দিয়েছে তার জন্যে তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই...তোমার দিব্য প্রেম হে ভগবান! যাদের তুলে ধরেছে অজ্ঞান অন্ধকারের বিশৃঙ্খলা হতে, তাদের প্রাপ্য সম্মান পায় যেন তারা—এই আমার প্রার্থনা।"

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মা ক্রমেই বেশী আশান্বিত হয়ে উঠছেন—চেতনার নব উন্মেষের সম্ভাবনার জন্যে আকুল প্রার্থনা জানিয়ে মা বলছেন—

"...আমি ভবিষ্যতের দিকে ফিরে দাঁড়াই, আমার দৃষ্টি আরও

গম্ভীর হয়ে ওঠে…আমার একমাত্র ইচ্ছা এ যেন হয় একটা নতুন আন্তর যুগের আরম্ভ, যখন স্থূল বস্তুর উপর অধিকতর অনাসক্ত হয়ে তোমার দিব্য বিধান সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হতে পারি, তার প্রকাশের জন্য অধিকতর অনন্যমুখী হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারি। এ যুগ নিয়ে আসে যেম মহত্তর জ্যোতিঃ মহত্তর প্রেম, তোমার ব্রতে পূর্ণতর নিষ্ঠা।”

সেই নির্দিষ্ট দিন ৭ই মার্চ জাপানী কাগামারু জাহাজে ফ্রান্স থেকে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ সন্দর্শনে তীর্থ পরিক্রমায় শ্রীমা যাত্রা করলেন—এই প্রথম তাঁর এত দূরের পথ পরিভ্রমণ। মা আত্মস্থ—সমর্পিত প্রাণ, অনন্ত আকাশ ও জলরাশি তারই মাঝে উদগত হয় তাঁর প্রার্থনা—

“আজ প্রত্যুষে আমার প্রার্থনা সেই একই আস্পৃহা নিয়ে তোমার দিকে উঠে চলেছে, তোমার প্রেমকে জীবনে ফলিত করবে, চারিদিকে ছড়িয়ে দেবে বলে এত প্রবল বেগে এত সাফল্যের সঙ্গে যে যারাই আমাদের সংস্পর্শে আসবে তারা সকলেই পাবে বল, বীর্য, নবজীবন, জ্ঞানের আলো। শক্তি চাই জীবনকে নিরাময় করবার জন্যে, দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তিলাভের জন্যে, শান্তি আর অটল বিশ্বাস গড়বার জন্যে, মনস্তাপ মুছে ফেলে তার স্থানে সেই একমাত্র সত্যকার সুখ স্থাপন করবার জন্যে, যা রয়েছে তোমার মধ্যে, যার নেই নির্বাণ।

হে ভগবান! হে অনুপম বন্ধু! সর্বশক্তিমান প্রভু! আমার সমগ্র সত্তার মধ্যে প্রবেশ কর, তাকে রূপান্তরিত করে চল, যতদিন না আমাদের অন্তরে, আমাদের আশ্রয় করে একমাত্র তুমিই থাক জীবন্ত হয়ে।”

মা যে জাহাজখানি আশ্রয় করে চলেছেন, ক্রমে তা মায়ের নিকট হয়ে উঠছে দিব্য—মার অন্তর ভরে উঠেছে প্রশান্তিতে—মার চেতনার পরিধি ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে—তাঁর সামনে থেকে অচেতনা, অবচেতনা সব সরে যাচ্ছে—দিব্য চেতনা এসে তার স্থান অধিকার করেছে—মায়ের প্রার্থনা স্ফুরিত হ’ল—

"হে ভগবান! হে মধুরতম! এই জাহাজের উপরেই আমার এ সমস্ত উপলব্ধি হয়েছে। জাহাজখানি যেন মনে হয় শান্তির ধাম, পুণ্য মন্দির—তোমারই পূজা দিয়ে সে যেন চলেছে অসাড় অবচেতনার তরঙ্গরাশি ভেদ করে...

পূণ্য সে দিন যে দিন তোমায় আমি জানতে পেরেছি হে অনির্বচনীয় শাশ্বত! সকল দিনের মধ্যে পুণ্যতম সে দিন যে দিন অবশেষে জাগ্রত হয়ে পৃথিবী তোমায় জানবে. কেবল তোমারই জন্যে জীবন ধারণ করবে।"

১০ই মার্চ তারিখে মা তাঁর ধ্যান লিপিতে, সেই যাত্রায় যাদেরই সংস্পর্শে আসছেন জাহাজের সেই সকলের জন্যে, দূরে সমুদ্রের গভীরে যে সকল প্রাণী বিরাজমান রয়েছে, সেই জানা অজানা সকল জীবের জন্যে, দূরে ছেড়ে আসা সকল স্বজন ও বন্ধুদের জন্যে—ভগবানের নিকট শুভ প্রার্থনা নিবেদন করে লিখলেন—

"রাত্রির নীরবতায় তোমার শান্তি সর্বত্র বিরাজ করে, আমার হৃদয়ের নীরবতার মধ্যেও তোমার শান্তি সর্বদা বিরাজমান। ...আমার মনে হ'ল তাদের কথা যারা জাহাজের উপর জেগে পাহারা দেয় পথ নির্বিঘ্ন রাখবার জন্যে, হৃদয় আমার কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল, আমি কামনা করলাম যাতে তাদের অন্তরে শান্তি নেমে আসে, পায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। তারপর মনে হ'ল তাদের সকলের কথা যাঁরা একান্ত আত্মবিশ্বাসী, ভাবনাহীন, নিশ্চেতনার ঘুমে নিমগ্ন, তাদের দুঃখ দৈন্যের জন্য চিন্তিত হয়ে,...করুণার্দ্র চিত্তে আমি কামনা করলাম যাতে তাদের হৃদয়ে তোমার শান্তির একটুখানি অন্ততঃ স্থান পায়, আধ্যাত্মিক জীবন যেন তাদের মধ্যে ফুটে ওঠে, আলো এসে দূর করে যেন অজ্ঞান, অন্ধকার। তারপর আমার মনে হ'ল সেই সব জীবের কথা যারা এই বিপুল সাগরের বুকে বাস করে, কামনা করলাম যাতে তাদেরও উপর প্রসারিত হয় তোমার শান্তি। আমার মনে হ'ল তারপর তাদের কথা যাদের ফেলে এসেছি বহুদূরে,

যাদের প্রীতি এখনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, গভীর স্নেহভরে তাদের জন্যে প্রার্থনা করলাম যাতে তারা পায় তোমার সচেতন ও স্থায়ী শান্তি ··এদের সকলের জন্যে গভীর সমাহিত চিত্তে নীরব অরাধনায় তোমার শান্তি আমি ভিক্ষা করলাম।"

সমুদ্র যাত্রার দৃশ্য বৈচিত্রে মা মুগ্ধ হলেন। মাঝ সমুদ্র দিয়ে জাহাজ চলেছে, চারিদিকে অনন্ত জলরাশি—কূল দেখা যায় না। চারিদিকে শুধু আকাশ আর সমুদ্রের নীল জল, একে অপরকে আলিঙ্গন করে এক হয়ে গেছে দিগ্বলয়ে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অপূর্ব —ক্ষণে ক্ষণে আকাশের রংয়ের বদল হচ্ছে—শুধু আকাশ আর নীল জল—দীগন্তও বৃত্তাকার হয়ে দেখা দিয়েছে।

জাহাজ এসে পোর্ট সৈয়দে পৌছিল। জাহাজ আসতেই পোর্ট সৈয়দের কন্সাল এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন—মা'দের আপ্যায়িত করলেন। তিনি বাহা সম্প্রদায় ভুক্ত এবং আবদুল বাহার নিকট হতে পত্র পেয়েছিলেন মা'র সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। পারী থেকে রওনা হওয়ার পূর্বেই আবদুল বাহা মাকে বলেছিলেন যে রাস্তায় বাহা সম্প্রদায়ের লোকেরা মাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

পোর্ট সৈয়দ ত্যাগ করে জাহাজ সুয়েজ ক্যানাল ধরে আবার অগ্রসর হয়ে চলেছে—মা-ও দেখতে দেখতে চলেছেন। দুধারের দিগন্ত বালুরাশি দেখতে দেখতে মা আত্মস্থ হ'লেন, তাঁর ধ্যান লিপিতে লিখলেন—

"ধূ-ধূ মরুভূমির অপরিবর্তনীয় নির্জনতার মাঝে, হে প্রভু এমন একটা কিছু আছে যা থেকে তুমি যে রাজেন্দ্ররূপে বিদ্যমান তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তাই এখন বুঝতে পারছি কেন এই বিপুল বিস্তৃত;বালুরাশির মধ্যে আশ্রয় নেওয়া চিরকাল ধরেই তোমাকে পাবার একটা উৎকৃষ্ট পন্থা বলে চলে এসেছে।

কিন্তু তোমাকে যে জেনেছে, তার কাছে তো তুমি সর্বত্র বিরাজ-মান, সব কিছুতে তুমি রয়েছে। তাই কোন বিশেষ একটি বস্তু অন্য-

আর একটির চেয়ে তোমাকে প্রকাশ করার জন্যে বিশেষভাবে উপযোগী তা সে মনে করে না। কারণ সব কিছুই যা প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান এবং আরও অনেক কিছু যা এখন নেই, সবই তোমাকে প্রকাশ করবার জন্যে প্রয়োজন। তোমার দিব্য-প্রেম পৃথিবীতে কর্মনিরত বলেই এ জগতের প্রতিটি বস্তুর মাঝে রয়েছে তোমা অভিমুখে জীবনকে পরিচালিত করবার প্রচেষ্টা। আর যেই মানুষের বন্ধ চোখ খুলে যায়, অমনি সে অনুক্ষণ এই প্রচেষ্টা দেখতে পায়।

হে প্রভু, তোমারই জন্য হৃদয় আমার তৃষিত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, আর আমার চিন্তা অনুক্ষণ তোমারই সন্ধানে রত। শ্রদ্ধামৌন অন্তরে আমি তোমাকে প্রণিপাত করি।"

বাইশ দিনে এইভাবে মা ভগবান ও প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে এক হয়ে উঠলেন—২৮শে মার্চ জাহাজ এসে কলম্বোয় পৌঁছিল। মা এখানকার এক বিখ্যাত বৌদ্ধ ধর্মপাদের নামে চিঠি এনেছিলেন—তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। যদিও দেখাসাক্ষাৎ বা লৌকিকতা করা বৌদ্ধ সন্নাসীদের ধর্মবিরুদ্ধ রীতি, তথাপি সেই বৌদ্ধভিক্ষু মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তিনি ও তাঁর মা, মা'দের পরম পরিতোষ সহকারে খাওয়ালেন। ভিক্ষুর মা-ই সব নিজহাতে রেঁধেছিলেন। তারপরে সেই ভিক্ষু মায়ের গাড়ীর পাশে পাশে চলে তাঁকে রেল ষ্টেশন পর্যন্ত পৌঁছেও দিলেন।

মা বৌদ্ধভিক্ষুর আতিথেয়তায় অভিভূত হলেন—তিনি আশাই করেন নি যে নীতিগত সব বাধা সরিয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাঁদের এত যত্ন আত্তি করবেন।

মা বলছেন ফ্রান্স ত্যাগ করে এত দীর্ঘ পথ ভ্রমণ এই তাঁর প্রথম। কত রকমের অসুবিধাই তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু কে যেন তাঁকে সকল অসুবিধা, সকল বিপদের মাঝে স্বচ্ছন্দে আগলে নিয়ে এসেছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সমস্ত ঘটনার পিছনেও যেন কার নিপুণ হাত অন্তরালে থেকে সব কিছু ব্যবস্থা

করছিল বলে মা'র মনে হ'ল।

কলম্বো থেকে পণ্ডিচেরীর পথেও কিছুটা বিভ্রাটে পড়তে হয় মাকে—কিন্তু ভগবানের বরাভয় তাঁর সব বিপদের অবসান ঘটিয়ে তাঁকে তাঁর অভিষ্টে পৌঁছে দেয়। ঐ যাত্রার কথায় মা বলছেন—"প্রথম যখন পণ্ডিচেরী আসি তখন আমাদের জাহাজ কলম্বো বন্দরে থামতে আমি ইচ্ছা করেছিলাম ট্রেনে রামেশ্বরম্ থেকে ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সির মধ্য দিয়ে চলে পণ্ডিচেরী পৌঁছিব। সে সময় কলম্বোয় কলেরার খুব প্রকোপ হওয়ায় রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রী নিতে রাজী হলেন না—ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাইলেন। আমি ট্রেনে যাব ঠিক করেছিলাম—কিন্তু কলেরার কথা কিছুই জানতাম না। কেবল মনে আছে কলম্বোতে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুক স্থানান্তরে যেতে দেখেছিলাম। সেদিন হঠাৎ আমি নিজেও অনুভব করলাম যেন অসুখ আমার নিজের দেহকে আক্রমণ করছে। তখন বিশেষভাবে নিজের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে এবং একাগ্রভাবে মনঃসংযোগের দ্বারা অসুখকে তাড়িয়ে দিলাম।"

শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের সার্টিফিকেট না থাকায় মায়ের আর ট্রেনে যাওয়া হয় নি—জাহাজেই পণ্ডিচেরীর পথে রওনা হলেন মা। জাহাজ এগিয়ে চলেছে—পণ্ডিচেরী যখন আর ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূরে তখন মা এক অত্যাশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। মা বলছেন—"কোন দিকে পণ্ডিচেরী তা আমি জানতাম না তখন, জাহাজ যখন সমুদ্রবক্ষে ভাসমান তখন দিক-নির্ণয় যন্ত্র ছাড়া কোন্ দিকে জাহাজ চল্‌ছে তা বুঝতে পারা যায় না। কূল বলে যখন কোন ধারণাই নেই তখন আমার দেহের একটা দিকে চুম্বকের আকর্ষণের মত একটা প্রচণ্ড টান অনুভব করতে থাকলাম। হঠাৎ এটা হ'ল, এবং জাহাজ যত এগিয়ে চলেছে ততই তা বাড়তে লাগল। তৎক্ষণাৎ আমার অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তির ইশারায় বুঝতে পারলাম পণ্ডিচেরী ঠিক সেই দিকেই এবং শ্রীঅরবিন্দের যোগ শক্তির প্রভাব এতখানি বিস্তৃত হয়ে রয়েছে।"

জাহাজ যতই পণ্ডিচেরীর তীরভূমির নিকটবর্তী হতে থাকে মা তাঁর অতীন্দ্রিয় বোধে দেখতে পান সহরের কোন এক কেন্দ্র হতে এক উজ্জ্বল নীল আলোক রশ্মি উপরে উঠে ঝলমল করছে। তারপরে জাহাজ থেকে নেমে মা যখন ভারতের মাটি স্পর্শ করলেন—ঠিক সেই পবিত্রতম মুহূর্তে সেই অপূর্ব নীল আলোক-ঝর্ণার আরও গভীরতম উপলব্ধি হ'ল মায়ের*—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চারপাশে ছিল যে সব জিজ্ঞাসু ও আত্মা তাদের সকলের হয়েই মা তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করলেন তাঁর পরম অভিষ্টের নিকট—

"হে পরাচেতনা! তুমি আমাদের চালিত কর, আলোকিত কর; তুমি নির্দেশ দাও, প্রেরণা দাও। এই সব দুর্বল জীব যেন সবল হয়, ভীত যারা তারা যেন আশ্বস্ত হয়, তোমার হাতে তাদের আমি সমর্পণ করি, সমর্পণ করি আমাদের সকলের নিয়তি।"

২৯শে মার্চ ১৯১৪ সাল –দিনটি বিশ্বের আধ্যাত্মিক ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম স্মরণীয় দিন—শ্রীমায়ের অভিনব প্রার্থনা মূর্ত হয়ে এইদিন রূপ পরিগ্রহণ করে—ধ্যান সাধনায় দেখা তাঁর ইষ্ট, তাঁর পরম গুরুর দর্শন তিনি পেলেন সেই দিনের আপরাহ্নে। যে জ্যোতিঃর তিনি স্বপ্ন দেখেছেন এতদিন—তারই সামনা সামনি এসে দাঁড়ালেন তিনি এবং যে মুহূর্তে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে দেখলেন—সেই ক্ষণেই তিনি চিনতে পারলেন—ইনিই সেই পরম পুরুষ যাঁকে দেখছেন বারে বারে তাঁর সাধনার মাঝে ধ্যান নেত্রে, উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন যিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টির সামনে—যাঁকে তিনি কৃষ্ণ বলে ডাকতে শিখেছেন তাঁর অজ্ঞাতে। তিনি আরও দেখলেন—শ্রীঅরবিন্দের ভিতরে রয়েছে এক পূর্ণ সমর্পিত-প্রাণ আত্মা, প্রচণ্ড শক্তির আধার হয়ে।

*শ্রীঅরবিন্দ যখন ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে বোম্বাইয়ের এপোলো বন্দরে জাহাজ হতে নেমে প্রথম ভারতের মাটি স্পর্শ করেছিলেন তখন তিনিও এক বিশেষ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করেছিলেন—ভারতের অধ্যাত্ম চেতনা। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের স্পর্শ পাওয়া মাত্রই একইরূপ সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন উভয়কেই।

আবার শ্রীঅরবিন্দের দিক থেকেও—শ্রীমাকে দেখা মাত্র শ্রীঅরবিন্দও চাক্ষুষ করলেন এক পূর্ণ সমর্পিত আধারকে, মানুষী তনুতে দেহের প্রতিটি জীবকোষ পর্যন্ত ভগবৎ সমর্পিত এমনটি তিনি এর আগে আর কখনও দেখেন নি। মাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীঅরবিন্দ আশ্বস্ত হলেন যে সময় এসে গেছে, আর দেরী নেই—অতিমানসের কাল সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত হলেন। শ্রীঅরবিন্দ আরও লক্ষ্য করলেন মায়ের মধ্যে এক বিরাট শক্তি—যা পৃথিবীতে তাঁর যোগের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

উভয়ের যোগ সাধনা উভয়েরই অজান্তে ঠিক একই পথ ধরে—একই সাধনার ধারা বেয়ে এগিয়ে চলেছিল—কিন্তু এতদিন ধরে যে প্রশ্নের উত্তর, শ্রীঅরবিন্দকে দেখার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, মায়ের মনে মেলেনি—তা হ'ল জগতে মানব জীবনের প্রথম হতে ভগবদ রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা কি কোন দিনই সফল হবে না? তা কি চিরদিনই অপূর্ণ থেকে যাবে? তিনি পরে যখন শ্রীঅরবিন্দের সামনে এই প্রশ্ন তুলে ধরলেন—তখন শ্রীঅরবিন্দ বললেন—"এই বারেই তা সফল হবে।"

শ্রীমা ছোটদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—"শ্রীঅরবিন্দকে সচক্ষে দেখার আগে পর্যন্ত আমি এতদিন ধরে যে কঠোর সাধনা করেছিলাম, যে সব গভীর উপলব্ধি আমার হয়েছিল এবং যে সবের সম্বন্ধে আমার বেশ বিশ্বাসও ছিল, তাকে ঠিক অহঙ্কারও বলব না, তবে আমার সাধনার উচ্চ অবস্থা সম্বন্ধে যে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল—সে সমস্তই যেন এখন শূন্যে মিলিয়ে গেল। তাঁর কাছে এসে, তাঁকে পেয়ে, তাঁর হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে যেমন একদিকে বেশ স্বস্তি বোধ করলাম, কাঁধ থেকে সত্যই একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল—এতদিন ধরে একেবারে একা একা নিজেকে নিয়ে চলতে হয়েছে, সাহায্য পেয়ে এসেছি সর্বত্রই কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভর করবার মতন কাউকে পাইনি—নিজের সম্বন্ধে যে দায়িত্ব, সর্বদা যে কঠোর রীতি নীতির মধ্যে নিজেকে

বেঁধে রাখতে হ'ত—এখন সে সবের থেকে ভারমুক্ত হ'লাম ; এখন থেকে আমাকে আর নিজের জীবনের বা সাধনার জন্যে কোন কিছুই ভাবতে হবে না, করতে হবে না, সর্বদা নির্দেশ পাব। তেমনি আবার আর এক দিকে, উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা আমার অন্তরে সত্যের স্বরূপ যে ভাবে আকার নিয়ে উঠেছিল, সে সমস্তই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, তার কিছুমাত্রও আর রইল না। আমি হয়ে উঠলাম শূন্য, একেবারে সম্পূর্ণ ফাঁকা। পুরাতন তার সকল ঐশ্বর্য নিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করল। আমি যেন নবজাত শিশুর মতন হয়ে আবার জন্মলাভ করলাম, পূর্বের সে আকৃতি আর নেই এখন।"

শ্রীঅরবিন্দকে দেখার পূর্ব পর্যন্ত মা বহু প্রকারের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি পেয়েছেন যা তিনি তাঁর প্রজ্ঞামনের সাহায্যে নিজ জীবনে আকরিত করার চেষ্টাও করেছেন। উন্নয়নের জন্য বহুপ্রকারের সামাজিক, আধ্যাত্মিক, শিল্পিজনোচিত ধারণা সমূহও তিনি পোষণ করতেন—কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে দেখার মুহূর্ত হতেই সকল মানসিক কল্পনা ও গঠন তাঁর চিরতরে রহিত হয়ে গেল।

সাক্ষাতের মুহূর্তে মা একটি কথাও বললেন না—শ্রীঅরবিন্দও তাই। মা, শ্রীঅরবিন্দের পায়ের কাছে চোখ বুজিয়ে বসলেন—মনকে উন্মীলিত করে ধরলেন শ্রীঅরবিন্দের দিকে। ক্ষণ যায় ক্ষণ আসে—কিন্তু কার জীবনে তা কি ফল নিয়ে আসে সে এক পরম বিস্ময়—আস্তে আস্তে উপর হতে মায়ের ভিতরে নেমে এল এক পরম নীরবতা ও তা তাঁর মনে স্থায়ী হয়ে রইল।

সব লুপ্ত হ'ল সব শূন্য হ'ল—সব কিছু সুন্দর মহৎ ধারণারাজি অবলুপ্ত হ'ল, রইল খালি এক শূন্যগর্ভ অচঞ্চল প্রতীক্ষা-যার স্থিতি মনের উর্ধে। মা সতর্কতার সঙ্গে তাঁর মনের নীরবতা রক্ষা করে চললেন—তারপরে ধীরে ধীরে উপর হতে নামতে আরম্ভ হ'ল "সত্য"। আর একমাত্র সত্যই চেতনার সারবত্তা সৃষ্টি করল। সব মানসিক ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। ঐ দিনের পর হতে মা আর মনের রাজ্যে

কোন দিনই বাস করেন নি। ধারণাসমূহ আর মনের দিক থেকে কোনদিনই উদয় হয় নি—সে সব এসেছে সত্যের জগত হতে, আর সত্য হতেই জন্মায় মনের ধারণ-সামর্থ এবং পৃথিবীতে প্রকাশের জন্যই হয় তার প্রয়োজন।

শ্রীঅরবিন্দের এই নির্বাণ অবস্থা লাভ হয়েছিল ১৯০৮ সনে—যখন তাঁর সব চিন্তা লয় হয়ে গিয়েছিল এবং যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তাঁর সক্রিয় যোগ পদ্ধতি।

শ্রীমায়েরও এই নির্বাণ এ'ল ১৯১৪ সনে—৬ বছর পরে—শ্রীঅরবিন্দের সহিত একই বয়সে।

৫

মায়ের নব জীবন লাভ

"বহির্মুখী মনোবৃত্তির স্থানে এক গভীরতর বিশ্বাস ও দৃষ্টিকে স্থাপন করতে হবে যা শুধু ভগবানকেই দেখবে, কেবল ভগবানেরই সন্ধান করবে। সমগ্র প্রকৃতির সর্বাঙ্গীন আত্ম-সমর্পণ চাই—আত্মা, মন, ইন্দ্রিয়, হৃদয়, এষণা, প্রাণ, দেহ—সকলকেই নিজ নিজ সমগ্র শক্তি পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে হবে, যাতে এই সত্তা দিব্যপুরুষের যোগ্য আধার হয়ে উঠতে পারে।"

—যোগসমন্বয়

শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করার পরের দিনই—৩০শে মার্চ শ্রীমা তাঁর ধ্যানের উপলব্ধিতে লিখলেন—

"যারা তোমার সেবায় অখণ্ডভাবে সমর্পিত, তুমি যে এসেছ, উপস্থিত রয়েছ—এই চেতনার অবস্থা যারা পূর্ণরূপে লাভ করেছে, তাদের সামনে নিজেকে দেখে মনে হয়, যে বস্তু আমাকে উপলব্ধি করতে হবে, তা থেকে এখনও আমি দূরে বহুদূরে রয়ে গেছি। এবং এও জানি যে, যে অবস্থাকে আমি উচ্চতম, মহত্তম এবং পবিত্রম বলে ধারণা করে রেখেছিলাম, তা, যে অবস্থা আমাকে লাভ করতে হবে, তার কাছে অন্ধকারময় এবং অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন বই আর কিছুই নয়। কিন্তু আমার এই অনুভূতি, আমাকে ভগ্নোদ্যম করা তো দূরে থাক, বরং সকল বাধা জয় করবার জন্যে, আমার অভীপ্সা, আমার সামর্থ এবং আমার ইচ্ছা শক্তিকে আরও উদ্দীপিত এবং আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে, যাতে পরিশেষে তোমার দিব্য বিধানের সঙ্গে, তোমার বিশ্ব-লীলার সঙ্গে আমি নিজেকে মিলিয়ে এক এবং অভিন্ন করে তুলতে পারি।

ধীরে ধীরে দিগ্বলয় পরিস্কার হয়ে উঠছে—পথ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে—প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছি নিশ্চয় হতে আরও নিশ্চয়ের দিকে।

শত শত জীব যদি গাঢ়তম অজ্ঞানের মধ্যে নিমজ্জিত রয়ে

থাকে—কিছু এসে যায় না তাতে। কাল যাঁকে আমরা দেখেছি তিনি পৃথিবীতে আছেন—তাঁর উপস্থিতিই যথেষ্ট প্রমাণ যে একদিন আসবে যখন অন্ধকার আলোকে রূপান্তরিত হবে, যখন তোমার রাজত্ব সত্য সত্যই পৃথিবীর উপর স্থাপিত হবে।

হে ভগবান্! এই অত্যাশ্চর্যের দিব্য স্রষ্টা, আনন্দে কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আমার পরিপ্লুত হয়ে যায় যখন এ চিন্তা আমি করি—আশা আমার অসীম হয়ে ওঠে।

হে মোর দেবতা! তোমাকে আরাধনা করার ভাষা আমার নেই—প্রণতি আজ মুক-মৌন।"

শ্রীঅরবিন্দকে দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের আশা ও অভীপ্সা নবরূপে রূপায়িত হতে থাকে, অধ্যাত্ম চেতনার এক নূতন উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ মায়ের জ্ঞান নেত্রে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে তাঁর সকল সাধনা সকল উপলব্ধি তিনি শ্রীঅরবিন্দকে সমর্পণ করে পরম নিশ্চিন্ত হন। তাঁর মতন উচ্চ আধারেরও অনুভূতিতে আসে যে তাঁর এতকালের সাধনাকে আবার নূতন পর্যায়ে আরম্ভ করতে হবে। তিনি দেখলেন শ্রীঅরবিন্দের সর্ব সত্তায় প্রকাশ রয়েছে এক অপূর্ব অখণ্ড সর্বাত্মক সমর্পণ—শ্রীমা অনুভব করলেন তার বিপুল শক্তি, তিনি পরবর্তীকালে বললেন—

"পৃথিবীতে আমি একজনকেই জানি যাঁর পূর্ণ সমর্পণের অবস্থা আমি সচক্ষে দেখেছি—আর সে একজন হলেন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ। প্রথম দর্শনে যখন আমি তাঁকে তাঁর সাধনার বিষয়ে প্রশ্ন করি, তখন তিনি যে বস্তুর অপেক্ষায় রয়েছেন বলেন, সে বস্তু যে তাঁরই মধ্যে এসে গেছে তা যেন তিনি জানতেন না তখনও, এতই ছিল তাঁর সমর্পণ আত্ম-বিলুপ্ত। আর সেই আত্ম-অবলুপ্ত সমর্পিত আধারে যে কি প্রচণ্ড শক্তি নেমে রয়েছে তার আভাস মাত্র নয়, প্রত্যক্ষ স্পন্দনের অনুভূতি আমার বাহ্যদেশে পর্যন্ত আমি লাভ করি তাঁকে দেখার কিছু আগে থেকেই।"

পণ্ডিচেরী পৌঁছিবার কিছু পূর্ব থেকেই জাহাজে মা যে আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন এবং মায়ের অতীন্দ্রিয় শক্তি বলে যা তিনি শ্রীঅরবিন্দের যোগশক্তি বলে জানতে পারেন—সেই শক্তির কথাই বর্ণনা করছেন মা। এতদিন ধরে মা যার জন্যে সন্ধান করেছেন—অধ্যাত্ম পথ পরিক্রমায় মা অনিমেষ চিত্তে এতদিন যার জন্যে সাধনা করে এসেছেন—সেই অপূর্ব দুর্লভ বস্তুর স্পর্শ পেলেন মা শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে। তাঁর এতদিনের অন্বেষণ আজ সার্থক, তাঁর অন্তরাত্মা এক নতুন স্পন্দনে জেগে উঠেছে—সেই ভাব সমাধিতে নিমগ্ন থেকে মা পরের পর কয়েকদিনই লিখে চললেন তাঁর ধ্যান লিপি। ৩রা এপ্রিল মা লিখলেন—

"মনে হয় আমি যেন নূতন এক জীবন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করতে চলেছি, অতীতের কোন নিয়ম, কোন অভ্যাসই আর আমার কাজে লাগবে না। যাকে মনে হোত পরিণাম, আজ দেখি তা আয়োজন মাত্র। এখন বোধ হয় এ যাবৎ যেন আমি কিছুই করিনি, আধ্যাত্মিক জীবন যেন আদৌ যাপন করিনি, যেন তার পথে সবেমাত্র প্রবেশ করতে চলেছি, বোধ হয় আমি যেন কিছুই জানি না, কিছুই প্রকাশ করতে পারি না, সব উপলব্ধি, অনুভব ফিরে অর্জন করতে হবে। সমস্ত অতীত যেন খসে পড়েছে, সিদ্ধিও খসে পড়েছে; সব মিলিয়ে গিয়েছে যাতে সেখানে স্থান পায় এক নবজাত শিশু সমস্ত জীবনই যাকে গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে—যার কোন কর্মবন্ধনই নেই যা তার উপকারে আসবে, আবার কোন ভুলও নেই যা তাকে শুধরে নিতে হবে। আমার মস্তিষ্ক শূন্য, কোন জ্ঞান নেই, কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেই, কোন অসার চিন্তাও নেই আদৌ। আমি বোধ করি এই অবস্থার স্রোতে যদি নিজেকে অবাধে ছেড়ে দিতে পারি, যদি জানবার বা বুঝবার চেষ্টা না করি, যদি রাজী থাকি সম্পূর্ণভাবে অবোধ সরল শিশুটির মত হয়ে যেতে, তাহলে নূতন এক সম্ভাবনা আমার সম্মুখে ফুটে উঠবে। আমি জানি আমার আমাকে চিরতরে বিসর্জন

দিতে হবে, হ'তে হবে একখানি সাদা পাতা, তার উপর তোমার চিন্তা, তোমার ইচ্ছা, হে ভগবান, অবাধে, অবিকৃত ভাবে লেখা হবে।

বিপুল কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আমার ভরে উঠেছে, মনে হয় যার জন্যে এত অন্বেষণ করেছি, সেই দ্বার প্রান্তে আজ অবশেষে উপস্থিত হয়েছি।"

৮ই এপ্রিল ১৯১৪ তারিখে আবার মায়ের প্রার্থনা ধ্বনিত হ'ল—

"হে ভগবান! চিন্তায় আমার এসেছে শান্তি, হৃদয় হয়েছে স্থির। গভীর ভক্তি আর অসীম নির্ভরতা নিয়ে তোমার দিকে আমি ফিরেছি। আমি জানি তোমার প্রেম সর্বশক্তিমান, তোমার ন্যায়ের রাজ্য পৃথিবীর ওপর স্থাপিত হবে। আমি জানি সময় হয়েছে, শেষ আবরণটি সরে যাবে, সকল অন্যায় দূর হবে, তাদের স্থান গ্রহণ করবে শান্তি আর সম্মিলিত চেষ্টার যুগ। হে ভগবান! মন আমার অন্তরের দিকে ফিরেছে, হৃদয় আমার শান্তি পেয়েছে। আমি চলেছি তোমার সন্নিকটে, আমার সমস্ত সত্তা তুমি ভরে রয়েছ। সকল জিনিসে আমি যেন তোমাকে দেখতে পাই, সকলে যেন তোমার দিব্য আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সকল বিদ্বেষ যেন দূর হয়ে যায়, সকল হিংসা যেন মুছে যায়, সকল ভয় যেন সরে যায়, সংশয় যেন নির্মূল হয়, সকল অপশক্তি যেন পরাজিত হয়। এই নগরে, এই দেশে, এই পৃথিবীতে সকলে যেন অনুভব করে যে তার হৃদয় মধ্যে এই মহাপ্রেম, সকল রূপান্তরের এই উৎস স্পন্দিত হয়ে উঠেছে।

হে ভগবান তোমার প্রেমের কাছে আমার সনির্বন্ধ এই ভিক্ষা—আমার অভীপ্সাকে এতখানি তীব্র করে তোল যেন তার ফলে সর্বত্র অনুরূপ আস্পৃহা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে; দয়া, ন্যায়, শান্তি যেন একচ্ছত্র প্রভু হয়ে রাজত্ব করে; অজ্ঞান, অন্ধকার যেন পর্যুদস্ত হয়, অন্ধকার যেন তোমার নির্মল আলোকে তৎক্ষণাৎ আলোকিত হয়, অন্ধ যেন লাভ করে দৃষ্টি, বধির পায় যেন শ্রবণ শক্তি, তোমার দিব্য বিধান যেন সর্বত্র ঘোষিত হয়; তোমার সঙ্গে সম্মিলন যেন নিরন্তর নিবিড়তর

হয়ে চলে, সুসামঞ্জস্য যেন অবিরল সুষ্ঠুতর হয়ে ওঠে, সকলে যেন একসঙ্গে মিলে তোমার দিকে বাহু প্রসারিত করে দেয়, চায় তোমার সঙ্গে সংযুক্ত হতে, পৃথিবীর উপরে তোমাকে প্রকাশ করতে।

হে ভগবান! মনকে অন্তর্মুখী করে, হৃদয়কে সূর্যালোকে পূর্ণ করে, তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করি অকুণ্ঠ ভাবে, আমার 'আমি' তোমার মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়।"

মায়ের দেহ বোধ লুপ্ত হয়েছে, অসীমের স্পর্শ মায়ের সর্বসত্তায়—গভীর শান্তিতে তা অনুরণিত—বিশালতায়, আলোকে, প্রেমে, আনন্দে মা এখন পরিপূর্ণ—মায়ের চোখে সবই হয়ে উঠ্ছে মাধুর্যময়, অতুলনীয়—বীর্য, এষণা ও করুণায় ভরা। ভগবানকে ডেকে মা বলছেন—"ভগবান! আমি কৃতকৃতার্থ তুমি আমার প্রার্থনা শুনেছ, তোমার কাছে যা চেয়েছি তা তুমি আমাকে দিয়েছ।"—এই আত্ম-অবলুপ্ত অবস্থায় মা দেখছেন তাঁর আবরণ, তাঁর বাধা সব এক এক ক'রে সরে যাচ্ছে। এই আত্ম-অবলুপ্তির ভিতরে মা তাঁর ধ্যান লিপিতে লিখলেন—

"সহসা আবরণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, দিঙমণ্ডল উদ্ভাসিত। এই নির্মল দর্শন লাভ করে আমার সমগ্র সত্তা কৃতজ্ঞতায় পরিপ্লুত, তোমার পদতলে নিজেকে ধরে দিয়েছে।...মনে হয় আমার নাই কোন সীমা, শরীরের বোধ পর্যন্ত আর নেই, নাই কোন সংবেদন, কোন অনুভব, কোন চিন্তা...আছে শুধু নির্মল বিশুদ্ধ প্রশান্ত বিশালতা, আলোকে প্রেমে অনুস্যূত, অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ—এ ছাড়া আমি যেন আর কিছুই নই; আর এ আমি, আমার পূর্বের আমি, স্বার্থপর সীমাবদ্ধ আমি হতে এত বিভিন্ন যে বলতে পারি না তা আমি না তুমি।"

মায়ের নিকট সবই যেন হয়ে উঠ্ছে—বীর্য, সাহস, বল, এষণা, অসীম মাধুর্য, অতুলনীয় কারুণ্য...কয়েকদিনের চেয়ে এ অনুভব যেন এখন আরও প্রবল হয়ে উঠ্ছে—অতীতের মৃত্যু ঘটেছে, যেন নতুন

এক জীবনের কিরণরাজি মাকে পরিপ্লাবিত করছে। মা আনন্দে পরিপূর্ণ—তিনি তাঁর ভগবানকে ডেকে বলছেন—

"হে ভগবান! তুমি আমার প্রার্থনা শুনেছ, তোমার কাছে যা চেয়েছি তা তুমি দিয়েছ। 'আমি' চলে গিয়েছে, এখন রয়েছে কেবল তোমার সেবায় নিযুক্ত, অনুগত যন্ত্র, তোমার অনন্ত কিরণরাজিকে সংহত ও প্রকাশিত করবার কেন্দ্র। তুমি আমার জীবন গ্রহণ করেছ, তোমার নিজের করে নিয়েছ, তুমি আমার ইচ্ছাকে গ্রহণ করেছ এবং তোমার ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে ধরেছ, আমার ভালবাসাকে গ্রহণ করেছ—তোমার ভালবাসার সঙ্গে এক করে নিয়েছ, আমার চিন্তাকে গ্রহণ করেছ, তার পরিবর্তে স্থাপন করেছ তোমার পূর্ণ চেতনা।

শরীর মুগ্ধ হয়ে ধূলায় মাথা নত করেছে, নীরব আত্মহারা পূজায়। কিছুই নেই সেখানে, আছ কেবল তুমি, তোমার অক্ষয় শান্তির মহিমা নিয়ে।"

মায়ের চেতনা এখন ভগবদ চেতনার সঙ্গে এক—মা নিজে তা স্পষ্ট অনুভব করেছেন—তিনি চাইছেন সকলেরই যেন সেই সৌভাগ্য হয়—সকলেই যেন একই আত্মনিবেদনের অধিকারী হয়ে ওঠে—তিনি আকুল প্রার্থনা জানিয়ে তাঁর মধুচ্ছন্দ পরমকে বলছেন—

"...সবই সুন্দর, সবই সুসঙ্গত, সবই প্রশান্ত, সবই তোমাতে পরিপূর্ণ। প্রদীপ্ত সূর্যের মধ্যে তুমি সমুজ্জ্বল, মধুর সমীরণের মধ্যে তোমার ছন্দ বহমান, আমাদের হৃদয়ে মধ্যে তোমার প্রকাশ, তোমার নিবাস প্রত্যেক জীবের মধ্যে। এমন প্রাণী নাই, এমন তরুলতা নাই যা তোমার কথা আমায় বলে না, যা কিছুরই দিকে চক্ষু ফেরাই তারই উপর দেখি তোমার নাম লিখিত।

হে মধুময় অধীশ্বর তবে কি তুমি অবশেষে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করলে, আমি সম্পূর্ণ তোমারই হয়ে গেলাম, তোমার চেতনার সঙ্গে আমার চেতনা নিঃসংশয়ে এক হয়ে গেল? আমি এমন কি করেছি যার জন্যে এতখানি অপরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পেরেছি?

আমি শুধু একনিষ্ঠ হয়ে কামনা করেছি, স্থির-সঙ্কল্প নিয়ে চলেছি—তার বেশী নয়; এতো অতি সামান্য জিনিস।

কিন্তু হে ভগবান, এখন আমার মধ্যে আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা বিরাজ করে—এই সৌভাগ্য যাতে সকলেরই পক্ষে ফলাদায়ক, লাভজনক হয় তা তুমি করতে পার, কারণ তার ভিতর দিয়ে যত মানুষ লাভ করবে তোমার অনুভব, তত আর কিছুতে হবে না।

সকলে যেন হে ভগবান, তোমায় জানে, তোমায় ভালবাসে, তোমায় সেবা করে, সকলেই যেন সেই পরম আত্মনিবেদনের অধিকারী হয়।

ভগবান! হে দিব্যপ্রেম! জগতের মধ্যে ছড়িয়ে যাও, জীবনের নূতন করে জন্ম দাও, বুদ্ধিকে আলোকিত কর, অহংকারের বাঁধ সব ভেঙ্গে ফেল, অজ্ঞানের বাধা দূর কর, হও পৃথিবীর জ্যোতির্ময় অধীশ্বর।”

৬

আর্য পত্রিকা প্রকাশ ও শ্রীমায়ের প্রত্যাবর্তন

"কোন্ ধূসর অতীতে প্রবুদ্ধ মনের প্রথম কিরণ সম্পাতেই মানুষের মধ্যে জেগেছে এক লোকোত্তর এষণা—দিব্যস্বরূপের এক অস্ফুট আভাস তার মধ্যে এনেছে পূর্ণতার প্রৈতি। তাকে ছুটিয়েছে নিষাদ সত্বের অনির্বাণ আনন্দ দীপ্তির সন্ধানে, অমৃতত্বের নিগূঢ় চেতনায় আকুল করেছে তার অন্তর। যুগ-যুগান্তের ধারা বেয়ে চলেছে তার অবিশ্রাম এষণা, তার আদি নাই—বুঝিবা তার অন্তও নাই।"

—দিব্যজীবন

শ্রীমা, শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর চার বছরের অনন্য সাধনার ফল পৃথিবীর মানুষের গোচরে এনে, অনুপ্রাণিত করার জন্যে অনুরোধ জানালেন। স্থির হ'ল ইংরাজী ও ফরাসীতে "আর্য" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হবে—আরও স্থির হ'ল যে তার প্রথম প্রকাশ হবে শ্রীঅরবিন্দেরই জন্মদিনে ১৫ই আগষ্ট তারিখে। ১৯১৪ সালের ১৫ই আগষ্ট আর্যের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হ'ল। শ্রীমা নিজে ও মঁশিয়ে পল রিসার তার ফরাসী অনুবাদের ভার নিলেন।

পত্রিকা প্রকাশনের যাবতীয় কাজ—লিপি প্রেসে পৌঁছান, প্রুফ দেখা, কাগজ কেনা ও প্রেসে পাঠান, গ্রাহক সংগ্রহ ও নাম ঠিকানা লিখে পত্রিকা ডাকে পাঠান প্রভৃতি সব কাজই মাকে প্রায় একাই করতে হ'ত। এ ভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থার দায়িত্বও মায়েরই ছিল এবং এই ভাবেই আরম্ভ হ'ল পণ্ডিচেরীতে মায়ের কর্মযজ্ঞের প্রথম সূত্রপাত।

পত্রিকা প্রকাশনের কাজ কয়েক মাস চলতে না চলতেই সামরিক নিয়মানুসারে মঁসিয়ে পল রিসার ও পণ্ডিচেরীর অন্যান্য ফরাসী নাগরিকদের ফ্রাঁন্সে ফিরে যুদ্ধের কাজে যোগ দেওয়ার জন্যে ডাক এ'ল। শ্রীমাকেও তাই স্বাভাবিক ভাবেই ফিরে যেতে হবে—কিন্তু শ্রীমার, এই কাজ ও শ্রীঅরবিন্দের পূতঃ সান্নিধ্য, ছেড়ে যাওয়ার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। শ্রীমা তাঁর আধ্যাত্ম সাধনালব্ধ প্রবল ইচ্ছা-শক্তি তাই প্রয়োগ করতে থাকলেন যাতে করে তাঁকে ফিরে যেতে না হয়। তার

ফলও কিছু পরিমাণে ফল্‌ল—যেখানে অবিলম্বে ফেরার নির্দেশ সেখানে নির্দিষ্ট জাহাজ এসে পৌঁছিল ছয় মাস পরে। এটা একেবারেই অস্বাভাবিক ব্যাপার যে পণ্ডিচেরীর ফরাসী অধিবাসীদের ফেরার নির্দেশ দেওয়া সত্বেও তাঁরা দেশে ফিরতে পারছেন না জাহাজের অভাবে।

জাহাজ আসছে না—সেই সঙ্গে শ্রীমা-ও কিছুটা আশান্বিত হয়ে ভাবলেন যে যদি শ্রীঅরবিন্দ বলেন তাহলে তিনি ফিরে যাবেন না—কারণ তাঁর ফেরা বাধ্যতামূলক ছিল না। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের দিক থেকে এ সম্বন্ধে এতটুকুও আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া গেল না—তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। এক কথায় বলতে গেলে শ্রীমা-ই তখন "আর্য" পত্রিকার প্রাণ স্বরূপা বললেই চলে। তিনি চলে গেলে অতসব কাজ কে করবে—কে ঠিকভাবে সব পরিচালনা করবে? শ্রীমার মনে হ'ল এ অবস্থায় তো শ্রীঅরবিন্দেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে এ মানুষটি চলে গেলে এ সব কাজ কে করবে?,

শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশের অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকলেন। অবশেষে যাত্রার জন্য ৩রা মার্চ, ১৯১৫ তারিখে জাপানী জাহাজ কোমামারু এসে পৌঁছিল—শ্রীমার তখনও বিশ্বাস শ্রীঅরবিন্দ শেষ মুহূর্তে তাঁর যাত্রা বন্ধ করবেন। টিকিট কেনা হয়ে গেল, কেবিন রিসার্ভ হ'ল, মালপত্র গোছান সারা—যাত্রার সব প্রস্তুত, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তখনও সম্পূর্ণ নীরব। শ্রীমা শেষ মুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দের নিকট বিদায় নিতে এলেন—কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, কোন চিন্তা, কোন প্রশ্ন তাঁর মধ্যে নেই। শ্রীমা সমস্ত অন্তর প্রার্থনারত করে বিদায় চাইলেন—শ্রীঅরবিন্দও স্মিতহাস্যে বললেন—"বেশ"। পরম গুরুর সান্নিধ্য হতে বিদায়ের ক্ষণে দুঃখের পশরায় মন ভরে উঠলেও—তার অধ্যাত্ম মর্ম মনে মনে উপলব্ধি করলেন মা। ১৯১৫ সালের ৪ঠা মার্চ মা জাহাজে বসে তাঁর ধ্যান ও প্রার্থনায় লিখলেন—

"গভীর সাগরের বুকে জাহাজের চাকার প্রতিটি আবর্তন আমাকে

নিয়ে চলে যায় যেন আমার সত্যকার নিয়তি থেকে দূরে, যে নিয়তি ভাগবত ইচ্ছাকে সুষ্ঠুতম প্রকাশ করবে তা থেকে সরিয়ে দিয়ে। প্রত্যেক প্রহর চলে যায় আর ডুবিয়ে দেয় যেন সেই অতীতের মধ্যে যা ছেড়ে ছিঁড়ে চলে এসেছি আমি—নিশ্চিত জানি তবু, নবতর বৃহত্তর সিদ্ধির দিকেই আমার ডাক পড়েছে। আমার অন্তরাত্মার জীবন বাহ্য কর্মাবলীর ওপরে অবাধ শাসন স্থাপন করেছে, কিন্তু মনে হয় এর ঠিক সম্পূর্ণ বিপরীত যে-সব ব্যবস্থা তারই দিকে আমাকে পিছনে টেনে ধরতে চায় আবার সব কিছু। কিন্তু ব্যক্তিগত অবস্থা আমার বাহ্যতঃ যতই দুঃখের হোক না, চেতনা আমার এখন একটা লোকে স্থির প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, যা ব্যক্তিগত সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে সব দিক দিয়ে, সমগ্র আধার তাই শক্তির আনন্দের নিরন্তর অনুভূতি লাভে উল্লসিত।...”

শ্রীমায়ের মনে পড়ছে পণ্ডিচেরীর শান্তিময় নির্মল দিনগুলির কথা, চেতনার ঊর্ধায়ণের মধুর আবেশ—৭ই মার্চের ধ্যান লিপিতে মা লিখলেন—

“মনের মধুর নীরবতার দিন চলে গিয়েছে—কি শান্তিপূর্ণ নির্মল দিন সব। তার ভিতর অনুভব হ'ত সেই এষণা যখন তার সত্যের সমস্ত শক্তি নিয়ে আপনাকে সে প্রকাশ করত।...ভগবান! তোমার করুণা আমি ভিক্ষা করতে চাই না—কারণ তুমি যা চাও আমার জন্যে, আমিও তাই চাই। আমার সামর্থ্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল এগিয়ে চলা, নিরন্তর এগিয়ে চলা, এক পায়ের পর আর এক পা করে—পথের আঁধার যতই গাঢ় হোক, আর বাধাও যতই থাকুক। যাই ঘটুক না, ভগবান, তোমার নির্দেশ আমি বরণ করে নেব, ঐকান্তিক চিরস্থির প্রেম ভরে।...”

মা চলেছেন কোমামারু জাহাজে। পরম গুরুর সান্নিধ্য হতে চলে আসার পর হতেই মা কঠোর নিঃসঙ্গতা অনুভব করছেন, তিনি বলছেন—“জীবনে আর কোন মুহূর্তে, কোন অবস্থাতেই কখনও বোধ

হয় আমার এমন আবেষ্টনের মধ্যে বাস করতে হয় নি—আমার চেতনায় যা কিছু সত্য—আমার জীবনের যা কিছু সার, এ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সময় সময় আমার অখণ্ড সমর্পণের মধ্যে বিষাদের ছায়া আমি বন্ধ করতে পারি না।”

মা ভগবানকে ডেকে বলছেন—“কি করেছি আমি যার জন্যে এমন আঁধারের মধ্যে আমাকে ফেলে দিয়েছ? তুমি আমাকে গাঢ়তম অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখছ তার হেতু কি এই যে আমার মধ্যে তোমার জ্যোতিঃ এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছ যাতে আমি এ অগ্নি পরীক্ষা হতে উত্তীর্ণ হই?”

পরের পর কয়েকটা দিন কেটে যায়—একটা শান্তির, গভীর উদাসীনতার অবস্থা এখন মায়ের—আধারের মধ্যে কোন অনুভব নেই, বাসনার বা বিরাগের, উৎসাহের বা অবসাদের, সুখের বা দুঃখের—মা লক্ষ্য করছেন শক্তিসমূহের সংঘর্ষ, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া—সময় সময়ে অনুভব করছেন এক আধ্যাত্মিক দৈন্যের হাওয়া—ভগবৎ পরিত্যক্ত পৃথিবীর যেন আকুল আহ্বান, মা বলছেন—“সময় সময় একটা বিপুল হাওয়া বয়ে যায়—বেদনার, মর্মন্তুদ নিঃসঙ্গতার, আধ্যাত্মিক দৈন্যের হাওয়া, ভগবৎ পরিত্যক্ত পৃথিবীর যেন আকুল আহ্বান। এ বেদনা নীরব, ততই ঠিক মর্মন্তুদ, তাই আনত অবিদ্রোহী—সে বেদনার মধ্যে কোন ইচ্ছাই নেই তাকে এড়িয়ে যেতে বা তা থেকে বের হয়ে যেতে, তার মধ্যে রয়েছে একটা অসীম মাধুর্য, যাতে নিবিড়ভাবে মিশে আছে দুঃখ আর আনন্দ, এমন একটা জিনিস, অসীম তার প্রসার, মহান গভীর—এত মহান এত গভীর যে মানুষের ধারণার অতীত তা, এমন এক জিনিস যার গর্ভে রয়েছে ভবিষ্যতের বীজ।

পরের পর অনেকগুলি দিন মা পরম ধ্যানে ডুবে রইলেন—জাহাজ চলেছে অগাধ জলরাশি ভেদ ক'রে—সেই সঙ্গে মায়ের চেতনাও অনন্ত বৈচিত্র্যের মাঝে স্থিতি লাভ করতে থাকে। মা এখন আত্ম-সমাহিত—আস্তে আস্তে মায়ের সংশয় কেটে যাচ্ছে—ভগবানকে

বলছেন—"ভগবান! তুমি আমার মনকে শেখালে তোমার দিব্য-সত্যের প্রকাশের যন্ত্র হয়ে, তোমার সনাতন ইচ্ছার বাহন হয়ে, পূর্ণভাবে কাজ করতে। মনকে তুমি তার শেষ বন্ধন হতে মুক্ত ক'রে দিলে, তুমি তাকে শেখালে গোপনে অবাধে সক্রিয় হ'য়ে উঠ্‌তে।" ভগবানকে তাঁর বর্তমান অবস্থা বর্ণনা ক'রে মা আবার বলছেন—"ভগবান! তোমার চিরন্তন ইচ্ছার কাছে পরিপূর্ণ ও সচেতন আত্ম-সমর্পণ হয়ে উঠ্‌ছে স্থির নিত্য অবস্থা এবং তা রয়েছে মনের, প্রাণের ও জড়ের প্রত্যেক ক্রিয়া, প্রত্যেক বৃত্তির পিছনে—ফলে এসেছে এই অক্ষুব্ধ প্রশান্তি, তারই এই অব্যভিচারী আনন্দ—যা হ'ল বিশুদ্ধ সত্যের কাছে আত্ম-সমর্পণের অপরিহার্য পরিণতি।"

৭

মায়ের কালজয়ী সাধনা ও শক্তিলাভ

"তুমি মেনে নিয়েছ আমার কালাতীত ইচ্ছাকে, তুমি বরণ করে নিয়েছ পার্থিব সংঘর্ষ আর নিয়তির মধ্যে আপন স্থান, পৃথিবীর মানুষের জন্য করুণায় আনত হয়েছ, ফিরে দাঁড়িয়েছ তাদের সাহায্যের জন্য তোমার হৃদয়কে আমার হৃদয়ের সঙ্গে বেঁধে দিলাম, তুমি পৃথিবীর অন্তরাত্মাকে তুলে ধরবে আলোকের মধ্যে, ভগবানকে নামিয়ে আনবে মানুষের জীবনের মধ্যে।"

—সাবিত্রী

এখন মায়ের প্রস্তুতি কাল—নিরন্তর একাগ্র সাধনায় মা আত্মস্থ—ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনায় চাইছেন সেই চেতনা ও শক্তি যাতে দৈনন্দিন কাজের ভিতরে তা এতটুকুও ম্লান না হয়—যাতে করে তাঁর পৃথিবীতে যে বিরাট দায়িত্বভার বহন করতে হবে তার জন্যে তিনি যেন প্রস্তুত হয়ে উঠ্‌তে পারেন। মা এক সর্বাত্মক সমর্পণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছেন সেই লক্ষ্যেরই দিকে।

১৯১৫ সনের ২রা নভেম্বর মা পারীতে। সাধারণ নিত্য নৈমিত্তিক কাজ সারার পর মা ধ্যান মগ্ন—তিনি তাঁর ধ্যানে বলছেন—

"সমস্ত জীবন ধরে, না জেনে পূর্বাভাষ না পেয়েও তোমাকেই সে খুঁজে চলেছে। তার সকল অনুরাগে, সকল উৎসাহে, সকল আশায়, সকল নিরাশায়, সকল দুঃখে, সকল আনন্দে তোমাকেই সে চেয়েছে ব্যাকুল হয়ে।"

মা এখন নিরন্তর গভীরতম সাধনায় ডুবে থাকেন—চেতনার অনন্ত বৈচিত্র নিয়ে উঠে মিশে যান বিশ্বচেতনায়—তাও আবার ছোটে ভগবানের দিকে—বিশ্বাতীতের পানে তীব্র আস্পৃহা নিয়ে, পূর্ণ সমর্পণ নিয়ে। মা বর্ণনা করছেন তাঁর ধ্যানাবস্থা—

"চেতনা সম্পূর্ণ ডুবে ছিল ভগবানের ধ্যানে, সমগ্র আধার ছিল এক পরম মহাসুখ ভোগে। স্থূলদেহ, প্রথমে তার নিম্নতম অঙ্গগুলি, পরে সমগ্রভাবে এক পুণ্য স্পন্দনে শিহরিত—সত্তা বড় হয়ে উঠ্‌ল

ধাপে ধাপে সুনিয়মিত ভাবে...যাতে সে ধারণা করতে পারে, প্রকাশ করতে পারে মহাশক্তি···চেতনায় অনুভবে আসে তার দেহ বিশ্বের দেহের মধ্যে মিশে গিয়েছে, এক হয়ে গিয়েছে—চেতনা তাই হয়ে উঠেছে বিশ্বচেতনা—বিশ্বচেতনা আবার ছুটেছে ভগবানের দিকে তীব্র আস্পৃহা ও পূর্ণ সমর্পণ নিয়ে—সে দেখ্‌ল জ্যোতির প্রভায় প্রজ্বলন্ত এক পুরুষ বহুশীর্ষে এক সর্পের ওপর দাঁড়িয়ে—সর্পটার দেহ পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরেছে অনন্তভাবে—আর সে পুরুষ তার সনাতনী বিজয় ভঙ্গীতে সর্পটিকে ও সর্প হতে নিঃসৃত বিশ্বকে একই সঙ্গে দমনে রেখেছেন ও সৃষ্টি করছেন—সমস্ত বিজয়ী শক্তি নিয়েই তিনি সাপটির ওপরে দাঁড়িয়ে···ক্রমে রূপের শেষ চিহ্ন লোপ পেয়ে গেল, চেতনা ডুবে মুছে গেল অনির্বচনীয়ের মধ্যে।···এর পরে ব্যক্তিগত দেহের দিকে প্রত্যাবর্তন ঘটল অত্যন্ত ধীরে—শক্তির, জ্যোতিঃর, আনন্দের অক্ষত প্রজ্বলতার ভিতর দিয়ে···।”

মায়ের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হতে চলেছে—অতিমানসের উপলব্ধির জন্য মা এগিয়ে চলেছেন—পূর্ণ সমর্পণের অবস্থা তাঁর এখন—শ্রীঅরবিন্দ প্রদর্শিত পূর্ণ যোগের আরোহণ অবরোহণের অভিজ্ঞতাই বোধ হয় মা বর্ণনা করছেন। মা ধ্যানে ও প্রার্থনায় একেবারে আত্মহারা, ভগবানের সঙ্গে তিনি এক হয়ে আছেন—তাঁর “আমি” এখন পরিণত হয়েছে “তুমিতে”—তাঁর সমর্পণ পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত—পূর্ণতর স্থিতিতে এখন তাঁর :অবস্থান। কয়েকমাস ধরেই এই অবস্থান্তর ঘটছে।

১৯১৬ সনের ১৫ই জানুয়ারী মা ভগবানকে বলছেন—তুমি কতশত সহস্র বছর ধরে এই জড়বস্তুটিকে (দেহ) গড়ে তুলেছ যাতে একদিন সজ্ঞানে সে তোমার সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে—“তুমি” হয়ে যেতে পারে। মা জিজ্ঞাসা করছেন—আজ যে তুমি আমার সামনে দিব্যরূপে দেখা দিয়েছ—সে কি পরম ভক্তিভরে চরম পূজার অর্ঘ্যরূপে এই ব্যক্তিসত্তা তোমাতে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেছে বলে? মা

ভগবানকে ডেকে বলছেন—তাঁর সর্বাঙ্গীন আস্পৃহাই হোল তাঁর সঙ্গে এক হওয়া—তাঁর মধ্যে ডুবে যাওয়া—কিন্তু মা কি তৈরী সেজন্যে? তাঁর যে কাজ চলেছে শত সহস্র বছর ধরে—সেই বিবর্তনের কাজ কি সেখানে সম্পূর্ণ হয়েছে?

মা আবার প্রশ্ন করছেন—আমি কি এই সত্যকার "আমি" হয়ে উঠেছি, অখণ্ডভাবে, সত্তার প্রতি অনুপরমাণুতে?

কিন্তু এততেও মা পূর্ণ নিঃসংশয় নন্, তাই তিনি পূর্ণ আকুতি করে ভগবানকে ডেকে বলছেন—"ভগবান শেষ বাধা সব ভেঙ্গে ফেল—শেষ অশুদ্ধি সব নিঃশেষে পুড়িয়ে দাও, প্রয়োজন হ'লে বজ্র হান—যদি তাতে এই আধার রূপান্তরিত হয়ে ওঠে।"

মা জাপানে এসেছেন ১৯১৬ সনের জুন মাসে। দীর্ঘ কয়েকমাস ধরেই মা গভীরতম ধ্যান সাধনায় ডুবে আছেন- মা এখন তাঁর ধ্যান লিপিতে অনুভূতি প্রকাশ করে আর কিছু লিখছেন না। এখন মায়ের অবস্থান্তরের সময়, এক স্থিতি হতে আর এক বৃহত্তর পূর্ণতর স্থিতিতে উত্তরণ—এই অবস্থায় ৫ই জুন মা পৌঁছিলেন এক ভিন্ন চেতনায়, মা বলছেন—"হঠাৎ পরদা ছিঁড়ে গেল—চেতনার মধ্যে আলো ফুটে উঠল।"

মা তাঁর ভগবানের নির্দেশ শুনতে পেয়েছেন, গভীর ভক্তিভরে আনত হয়ে মা তাঁর ভগবানকে বলছেন—"ভগবান! তুমি তোমার যন্ত্রকে হাতে তুলে নিয়েছ, কর্মের মধ্যে তাকে ব্যবহার করতে চেয়েছ। যন্ত্র জানে তার নিজের ত্রুটি, আবিলতাসমূহ তাই সে তোমার করুণা ভিক্ষা করে যাতে সে নির্দোষ বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, যাতে ক্রমে তার সকল লিপ্সা, সকল সীমা দূর হয়ে যেতে থাকে, পরিশেষে তোমাকে প্রকাশ করতে পারে আরও অখণ্ড ভাবে।"

মা এখন ভগবানের কাছে চাইছেন সেই চেতনা যা তাঁর দৈনন্দিন-কর্মের মধ্যেও থাকবে উজ্জ্বল হয়ে যেমন তা হয়ে থাকে তাঁর নির্মল শান্তির মুহূর্তে. তিনি তাই প্রার্থনা করছেন—"আমি তোমার কাছে

সদাসর্বদার জন্যে চাই আমাকে তুমি দাও সেই চেতনা, এখনকার মত নির্মল শান্তিময় মিলনের মুহূর্তে যা সব পাই। তোমার কাছে চাইব এই সব মুহূর্তকেই আরও শান্তিময়, আরও নির্মল করে ধর, চেতনাকে সামর্থে, আলোয় আরও ভরে দাও যাতে সে চেতনায় নূতন শক্তি, নূতন জ্ঞান নিয়ে তার দৈনন্দিন কর্মের মধ্যে ফিরে আসতে পারে।"

ভগবানের করুণায় এখন মায়ের অন্তর শান্তিতে ভরে গেছে, ব্যক্তিগত সকল সীমা মুছে গেছে মা দেখছেন সকলের অন্তরে তিনি রয়েছেন সকলেও রয়েছেন মায়ের অন্তরে—মায়ের মন এই দিব্যানন্দে ডুবে রয়েছে—এই অটল একাত্মতার নীরবতায় মা ভগবানের স্পষ্ট আদেশ শুনতে পেলেন, ভগবান বলছেন—

"ফিরে যাও পৃথিবীর দিকে—সর্বত্র যাদের মধ্যে তুমি দেখতে পাও সেই এককে—তারা ভগবানের সঙ্গে এই একত্বের চেতনা নিয়ে জেগে উঠবে। দেখ চেয়ে..."

মা চেয়ে দেখলেন জাপানের একটি রাস্তা—উজ্জ্বলবর্ণের সুসজ্জিত সুশোভিত জাপানী উৎসবের লণ্ঠনে রাস্তাটি আলোকিত। মায়ের সচেতন সত্তা তার মধ্যে এগিয়ে চলতে চলতে দেখলেন—প্রত্যেকের অন্তরে, সমস্তের অন্তরে ভগবানকেই দেখা যাচ্ছে—যার দিকেই মা চাইছেন—তার ভিতরেই মা ভগবানকে দেখতে পাচ্ছেন। একখানা ছোট হালকা ঘর মা দেখতে পেলেন—সে ঘরটি স্বচ্ছ—ভিতরটা সবই তার দেখা যাচ্ছে। একটি মেয়ে তার ভিতরে টাটামির (গদির) ওপরে বসে আছে, তার পরিধানে উজ্জ্বল সোনার রঙে কাজ করা একখানা বেগুনী কিমোনা। মেয়েটি সুন্দরী, বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ আর চল্লিশের মাঝামাঝি। সোনালী রংয়ের "সামিসেন" যন্ত্র সে বাজাচ্ছিল। পায়ের কাছে বসে ছিল একটি ছোট্ট ছেলে। মা মেয়েটির মধ্যেও ভগবানকে দেখলেন।

আর একদিনের ঘটনা। মায়ের চেতনা এখন অন্তের চেতনার

সঙ্গে, পৃথিবীর চেতনার সঙ্গে, গাছ পালা, জীব জন্তু মানুষ, সকলের চেতনার সঙ্গে এক হয়ে উঠ্‌ছে—অন্যেরও ব্যাথা বেদনা, আনন্দ শান্তি মার ভিতরে ফুটে উঠেছে, এই অবস্থায় মা বলছেন—

"একটা বিপুল একাগ্রতা আমাকে অধিকার করল, আমি দেখতে পেলাম একটি চেরী ফুলের সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে গেছি—তারপরে এই ফুলটির ভিতর দিয়ে যাবতীয় চেরী ফুলের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেলাম। চেতনার আরও গভীরে নেমে গিয়ে, একটা নীলাভ শক্তির স্রোতে চলে, আমি হয়ে উঠলাম একেবারে চেরী গাছটিই।"

৮ই ডিসেম্বর ১৯১৬ সাল—মা তাঁর পরমের বাণী শুনলেন, তিনি বলছেন—"(তোমার) কাজটি কি হবে তা তুমি জানবে যখন তা এসে উপস্থিত হবে। কিন্তু এখন থেকে তোমাকে আমি জানিয়ে রাখি, যাতে তুমি তার জন্যে তৈরী থাকতে পার, তাকে ঠেলে না সরিয়ে দাও। আমি তোমাকে জানিয়ে রাখি অনুদ্বেল, সাম্যময়, শান্তিময় ক্ষুদ্র জীবনের দিন চলে যাবে, দেখা দেবে প্রয়াসের, বিপদের, অপ্রত্যাশিতের, অব্যবস্থার অথচ তীব্রতার যুগ; এই ব্রতের জন্যই তুমি তৈরী হয়েছ। এত বৎসর ধরে তুমি যে কথা ভুলে থাকতে রাজি হয়েছিলে, কারণ সময় হয়নি, তুমিও তৈরী ছিলে না, কিন্তু এখন এই চেতনা নিয়ে জেগে ওঠ যে এই হ'ল তোমার সত্যকার ব্রত। এরই জন্য তুমি সৃষ্ট হয়েছিলে।"

মায়ের দিক থেকে উত্তর এল—"আমি তৈরী ভগবান, আমার ওপর তুমি নির্ভর করতে পার। তুমি যা চাও আমিও তাই চাই। তুমি তো জান ভগবান আমি সম্পূর্ণভাবে তোমারি।"

উত্তরে ভগবান আবার বলছেন—"এরই জন্যে তোমাকে তৈরী করে তুলেছি আমি, এরই জন্যে তো তুমি নিজেকে সুনম্য করে, সমৃদ্ধ করে ধরবার একটা সাধনার ভিতর দিয়ে চলেছ। কোনরকম কষ্ট প্রয়াস করতে যেও না—প্রয়োজন অনুসারে শক্তি আসে। অনন্তকাল ধরেইতো তোমাকে আমি নির্বাচিত করে রেখেছি। পৃথিবীর ওপর

তুমি আমার প্রতিভূ হয়ে থাকবে, অদৃশ্যভাবে গোপনভাবে নয়, প্রত্যক্ষভাবে, সকল মানুষের চক্ষুর সম্মুখে—যা হবার জন্যে তুমি সৃষ্ট হয়েছিলে তাই তুমি হবে।”

২০শে ডিসেম্বর ধ্যানের পর মা আবার তাঁর পরমের বাণী শুনতে পেলেন, তিনি বলছেন—

“আমার দিকে তুমি ফিরেছ যখন, তোমাকে বলি আজ এই সন্ধ্যায়—তোমার হৃদয়ের মধ্যে আমি দেখেছি একখণ্ড হীরক, তার চারদিক ঘিরে সোনার আলো।······আমি পৃথিবীর দিকে মানুষের দিকে ফিরেছি, আমার বাণী আমি তাদের দিয়েছি—পৃথিবীর দিকে মানুষের দিকে ফিরে দাঁড়াও এই আদেশই কি তুমি সর্বদা শুনছ না তোমার হৃদয়ের মধ্যে···সাহসে ভর করে দাঁড়াতে হবে, গভীরের আজ্ঞা পালন করতে হবে। তোমাকে আমি জানি ও ভালবাসি, তুমিও যেমন আমাকে জান ও ভালবাস, তাই তো এসেছি, তোমার দৃষ্টির সম্মুখে দেখা দিয়েছি সুস্পষ্ট রূপ ধ’রে, যাতে আমার কথায় তোমার কোন সন্দেহ না হয়।”

২৪শে ডিসেম্বর মা স্পষ্ট শুনলেন নীরবতার মধ্যে তাঁর পরমের বাণী, তিনি বলছেন—“সব তুমি ত্যাগ করেছ, জ্ঞান পর্যন্ত, চেতনা পর্যন্ত, তাই তোমার হৃদয়কে তুমি তৈরী করে তুলতে পেরেছ যে ভূমিকায় তোমায় নামতে হবে তার জন্যে···ওঠ তুমি প্রেম হয়ে সকল বস্তুর মধ্যে, সর্বত্র, নিরন্তর বৃহত্তর হয়ে, নিরন্তর তীব্রতর হয়ে—সমস্ত জগত হয়ে উঠবে তোমার সৃষ্টি, তোমার সম্পত্তি, তোমার কর্মের ক্ষেত্র, তোমার বিজয় গৌরব।···যুদ্ধ করে চল জয়ের জন্যে, পূর্ণ জয়ের জন্য, নবজ্যোতি উন্মুক্ত করে ধরবার জন্য, জগতের কাম্য সেই প্রমূর্ত আবির্ভাবের জন্য···।”

তাঁর মধুরতম ভগবানকে মা তখন ডেকে বলছেন—“হে পরম প্রিয় ভগবান আমার! এ হৃদয় তোমার কাছে অবনত, এ বাহুদুটি তোমার দিকে প্রসারিত, তোমাকে মিনতি করে, তোমার দিব্য স্পর্শে এই

সত্তাকে সমগ্রভাবে প্রজ্বলিত করে তোল, যাতে জগতের ওপর তার আলো ছড়িয়ে পড়ে।

প্রার্থনার উত্তরে মা শোনেন তাঁর ভগবান বলছেন—"সকল জিনিসের মধ্যে, সকল জীবের মধ্যে আমাকে ভালবাস।"

সঙ্গে সঙ্গে তারই উত্তরে মা তাঁর মধুর ভগবানকে বলছেন "তোমার চরণে আলুণ্ঠিত হয়ে তোমাকে মিনতি করি আমাকে তুমি দাও সে শক্তি…।"

নিরন্তর মা ও ভগবানের মধ্যে চলেছে সংলাপ এরই মধ্যে একদিন, ১৯১৭ সনের ২৭শে মার্চ তারিখে নিবিড় ধ্যানের মধ্যে পরম ভগবান ও মায়ের মধ্যের সংলাপ মা ধরলেন তাঁর ধ্যান লেখনীতে—

—"ভগবান! আমার সত্তার মধ্যে সব নীরব হয়েছে, অপেক্ষায় আছে।"

—"চেতনায় আঘাত কর, দরজা খুলে যাবে,

—শক্তি তোমার ফিরে আসছে…

—তুমি হবে কাঠুরে, ইন্ধনের জন্য কাঠের আঁটি বাঁধবে বলে,

—তুমি হবে হংসরাজ, পাখা মেলে উড়ে চলবে, তার মুক্তি শুভ্র ছটায় দৃষ্টি সব শুদ্ধ করে দেবে, তার পালকের শ্বেত আভায় হৃদয় সব তপ্ত করে তুলবে,

—তুমি সকলকেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তাদের পরম সার্থকতার অভিমুখে,

—তোমার হৃদয়ের মধ্যে এই যে সর্বজয়ী অগ্নিকুণ্ড—শুধু তুমিই তা ধারণ করতে পার…অন্য কেউ স্পর্শ করলে দগ্ধ হয়ে যাবে…

—একজন কেবল ঐ হৃদয়ের মধ্যে নির্ভয়ে বসবাস করতে পারে —কারণ সে হ'ল সেই রশ্মি যে তাকে প্রজ্বলিত করেছে…

—আর একজন আছে সবার উপরে, দাহনের কোন আশঙ্কা তার নেই…"

"এক হ'ল সিদ্ধির শক্তি,
আর এক হ'ল দিব্য জ্যোতিঃ,
তৃতীয়টি পরা চেতনা।"

মা তাঁর প্রাণের ভগবানকে উদ্দেশ করে বলছেন—"ভগবান তোমার কথা আমি শুনছি, মানছি, তোমাকে প্রণতি জানাই আমার—দরজা আমার তুমি খুলে দিয়েছ, চক্ষু খুলে ধরেছ—রাত্রির খানিকটা আলোকিত হয়েছে।"

আরও আট মাস সময় পার হ'ল—মায়ের সাধনা এখন নিবিড় হতে নিবিড়তম হয়েছে- ভগবানের একান্ত স্পর্শে মা সঞ্জীবিত—দিব্য চেতনায় মা স্পন্দিত, অধ্যাত্ম জীবনের শিখরে মা আসীন—তাঁর আজ সেদিনের কথা মনে পড়ছে, যে দিন শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্য ছেড়ে আসার প্রাক্কালে নিরাশায় ভগবানকে ডেকেছিলেন—সেদিনের শ্রীঅরবিন্দের মধুর হাস্যে বিদায় সম্বর্ধনা জানানর অর্থ বোধ হয় মায়ের নিকট আজ সুস্পষ্ট—তাঁর প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল—গভীর সাধনার প্রয়োজন ছিল। তাঁর সম্মুখে যে বৃহৎ কর্মযজ্ঞ অপেক্ষা করে রয়েছে, ভগবান তাঁকে তার জন্যে প্রস্তুত করে তুলবেন বলে—তাঁকে সেই শক্তি দেবেন বলে—তাঁর চেতনাকে আরও সমৃদ্ধ করবেন বলে তাঁকে সেদিন তাঁর অনিচ্ছা সত্বেও তাঁর ভবিষ্যত কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। এই সব কথাই মায়ের স্মরণ পথে উদিত হচ্ছে, এমনি এক দিনে ১৯১৭ সনের ২৫শে নভেম্বর তারিখে মা সার্থকতায় ভরপুর হয়ে ভগবানকে আত্ম-নিবেদন জানিয়ে বলছেন—

"ভগবান নিদারুণ এক দুঃখের মুহূর্তে আমার একান্ত আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে তোমায় আমি বলেছি, "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক," তাইতো তুমি এলে তোমার মহিমায়। তোমার পদতলে আমি প্রণিপাত করলাম। তোমার বুকের মধ্যে আশ্রয় পেলাম। আমার সত্তা তুমি ভরে দিলে তোমার দিব্য বিভায়, ভাসিয়ে দিলে তোমার পরম আনন্দে। তোমার সৌমিত্রকে দৃঢ় করলে, তোমার নিরবচ্ছিন্ন

সান্নিধ্যকে নিঃসন্দেহ করলে। বন্ধু তুমি, কখনও ব্যর্থ করনা আমাদের, শক্তি তুমি, সহায় তুমি, দিশারী তুমি। আলো তুমি সকল অন্ধকার দূর কর, বিজয়ী তুমি, জয় সুনিশ্চিত তোমার কল্যাণে।...

তোমার প্রতি আমার ভালবাসা ছিল এতদিন নিরুদ্ধ, এখন ফিরে আবার ছুটে বের হয়েছে অদম্য বেগে, দশগুণ শক্তি নিয়ে সর্বজয়ী হয়ে তার পরীক্ষার ভিতর দিয়ে। একান্তবাসে সে পেয়েছে বীর্য, সত্তার বাহ্যস্তরে উঠে আসবার সামর্থ, সমগ্র চেতনার ওপর আপন আধিপত্য স্থাপন করবার জন্যে—তার পরিপ্লাবী স্রোতে সকল জিনিস্ গ্রাস করবার জন্যে।...তুমি আমায় বলেছ, আমি এলাম ফিরে আর তোমায় ছেড়ে যাব না।

আভূমি প্রণত হয়ে তোমার প্রতিশ্রুতি আমি শিরোধার্য করি।"

জাপানে শ্রীমা—১৯১৬

শ্রীমা

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমায়ের নিজের হাতে পেন্সিলে রেখা চিত্র

৮
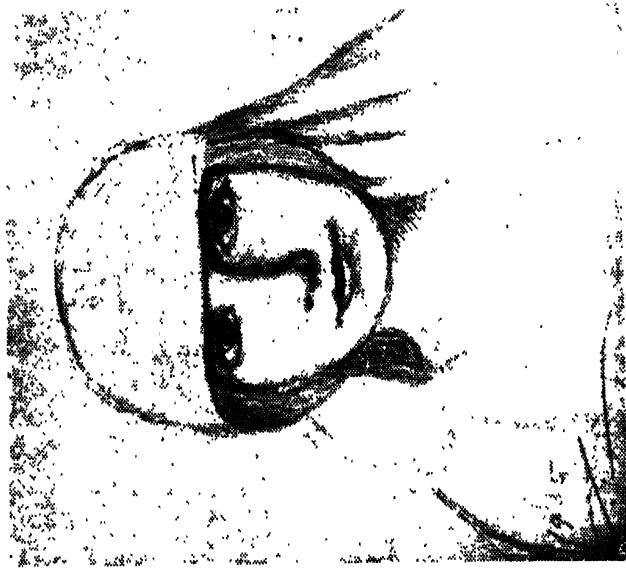
শ্রীমায়ের পুনরাগমন ও দিব্য কর্মধারা

"মানুষকে শাশ্বতের জ্যোতির আবাহন করতে হবে, তার সমগ্র জীবনকে হতে হবে আন্তর মহাশক্তির অনুগত সেবক…একদিন তাহলে অন্তর্জ্ঞানের প্রভা প্রকৃতির শিখর সব স্পর্শ করবে, প্রকৃতির অন্তস্থল এক দিব্য আবির্ভাবে স্পন্দিত হবে…পৃথিবী এই রকমে আপনাকে খুলে ধরবে ভগবানের কাছে…এই পার্থিব জীবন হয়ে উঠবে শাশ্বত জীবন।"

—সাবিত্রী

নির্জনবাসের অত্যুগ্র সাধনা অন্তে মা ফিরে এলেন পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ সন্নিধানে ১৯২০ সনের ২৪শে এপ্রিল তারিখে। সময় নির্দিষ্ট, তাঁকে ফিরে আসতেই হবে, কারণ এ ঘটনা সূক্ষ্মজগতে আগেই ঘটে গেছে। শ্রীঅরবিন্দ লীলায় তাঁরই তো প্রধান ভূমিকা। শ্রীঅরবিন্দ দর্শন ইতিমধ্যে জগত সমক্ষে আর্য পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার হয়েছে—যার সূচনা মা-ই করে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ ছয় বৎসরে মায়ের প্রস্তুতি ও সাধনকালও পার হয়েছে—তাঁর একাগ্র সাধনা, ধ্যান ও তপস্যা মূর্ত হয়ে উঠেছে পরমের পরশে, একান্ত নির্জনবাসে তিনি লাভ করেছেন বীর্য, শক্তি ও আনন্দ—ভগবানকে উদ্দেশ করে তিনি তাঁর পুনরাগমন কালের প্রাক্কালে বলছেন—

"…এখন হ'তে তাহলে হে ভগবান আনন্দ আমার কাছ থেকে আর তো ফিরিয়ে নেবে না? আমি মনে করি এবার আমার শিক্ষা পূর্ণ হয়েছে, ধাপে ধাপে আমি উঠে গিয়েছি শেষ চূড়ায় যেখানে রয়েছে নবজন্ম। সমস্ত অতীতের যতটুকু এখনও অবশিষ্ট তা হ'ল বিপুল এক প্রেমাবেগ, তা আমায় দিয়েছে শিশুর নির্মল হৃদয় আর দেবতার ভার-হারা মুক্ত চিন্তা।"

শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনা ও তার সুদূর প্রসারী ফল সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই বিশ্ববাসী আকৃষ্ট হয়েছে—জ্ঞানীগুণী মুমুক্ষু ও ভক্ত অপেক্ষমান তার পরিণতির আশায়—অধিক শ্রদ্ধাশীল যারা তাদের

আগমন হতে আরম্ভ হয়েছে পণ্ডিচেরীতে—শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরে সবার অজ্ঞাতে গড়ে উঠ্‌তে আরম্ভ হয়েছে আশ্রম। সবার ধ্যান সমাধিকে একাই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন শ্রীঅরবিন্দ—শ্রীঅরবিন্দ লীলায় তাদেরও প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দ নিজে, চেতনার স্তরের পর স্তর পার হয়ে, অধিমানসের দ্বার প্রান্তে এসে সমাসীন অতিমানসেরও উজ্জ্বল রূপরেখা তাঁর চোখের সামনে ভাসছে —একেবারে অন্তরালে যাওয়া ও তদাত্ম হয়ে গভীরতম সাধনায় আত্ম-বিলুপ্তির প্রয়োজন—আবার সেই সঙ্গে মায়ের মত পূর্ণ সমর্পিত আত্মা—যাঁকে দেখে ১৯১৪ সনেই শ্রীঅরবিন্দ আশান্বিত হয়েছিলেন অতিমানসের কাল সম্বন্ধে—তাঁরও যুগ্ম প্রচেষ্টার প্রয়োজন অভীষ্ট সাধনে—তাইতো মাকে ফিরে আসতে হয়েছে নির্ধারিত সময়ে ভগবদ ইচ্ছার অমোঘ বিধানে।

শ্রীমা এলেন শ্রীঅরবিন্দের যোগের যুগ্ম-সহায়ক রূপে—যেন দুই মহাবারিধি এক হোল। শ্রীমা'রও যোগশক্তি তখনই অতুলনীয়—দীর্ঘ ছয় বৎসর নির্জনে নীরব অনন্য সাধনে তিনি মহাশক্তিশালিনী। পণ্ডিচেরীতে ফিরে এসেও প্রথমে শ্রীমা নিজেকে শ্রীঅরবিন্দ সাধন ধারায় আবার একেবারে ডুবিয়ে দিলেন। নিজের ঘরে তিনি নিরন্তর ধ্যানমগ্ন থাকেন—বাহিরে আসেন কেবল দুবেলা খাওয়ার সময়ে আর বিকালে শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে তাঁর কথোপকথনের সময়ে এসে বসেন শ্রীঅরবিন্দের পদতলে ভূমি আসনে—আরও ছয় বছর কাটে এই ভাবে। সামনে যে ভাগবত কর্মের গুরুদায়িত্ব মাকে বহন করে চলতে হবে সে সম্বন্ধে মা পূর্ণ সচেতন। ১৯২০ সনের ২২শে জুন তারিখে মা তাঁর ধ্যান প্রার্থনায় লিখলেন—

"কোন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, করুণা করে তুমি আমায় দিয়েছিলে এমন আনন্দ, হে আমার দয়িত ভগবান, এখন তুমি দিয়েছ আবার পরীক্ষা, যুদ্ধ, কিন্তু একেও আমি হাসি মুখে গ্রহণ করেছি- তোমার মহান বার্তাবহরূপে। একদিন ছিল যখন আমি সংঘর্ষকে ভয়

করতাম—শান্তির ওপর সম্মেলনের ওপর আমার যে আন্তরিক অনুরাগ তা ব্যাহত হবে বলে। কিন্তু এখন ভগবান, আমি ওকে সানন্দে বরণ করে নিয়েছি—এতো তোমার কর্মের এক মূর্তি, তোমার কর্মের যে সব অঙ্গ হয়ত আমরা ভুলে বসতাম তাদের স্পষ্ট করে তুলে ধরবার ঐতো হ'ল শ্রেষ্ঠ উপায়—সঙ্গে করে এ নিয়ে আসে বিস্তারের, বৈচিত্রের, সামর্থের বোধ। একদিকে তোমাকে আমি দেখছি তোমার গৌরব উজ্জ্বল মূর্তিতে তুমি সংঘর্ষকে জাগিয়ে তুলছ, ঠিক তেমনই তুমিই আবার পরস্পর বিরোধী প্রেরণারাজির জটিলতা সব খুলে ধরেছ, পরিশেষে সর্বজয়ী হয়ে দাঁড়িয়েছ যা-কিছু তোমার আলোক তোমার শক্তি ঢেকে ফেল্‌ত তাদের উপর—কারণ সমস্তের মধ্য হতে উদ্ভূত হবে তোমার আপন সুষ্ঠুতর আত্মসিদ্ধি।"

শ্রীমা আসার পর হতে শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে অন্তরালে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকেন—আর্যপত্রিকাও বন্ধ হ'ল। শ্রীঅরবিন্দ আস্তে আস্তে যেমন যেমন সব কমিয়ে আনতে থাকেন, শ্রীমা-ও ক্রমে ক্রমে আশ্রম পরিচালনা, ভক্ত শিষ্যদের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, তাদের ধ্যান ধারণা পরিচালনার ভার সবই নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর অত্যুগ্র সাধনার সুযোগ ও সুবিধা করে দিতে থাকেন। শ্রীঅরবিন্দ বললেন—"সাধনা ও কাজ মায়েরই অপেক্ষায় ছিল।"

এবিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করেছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় তাপস শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, তিনি বলেছেন—"আমাদের জীবন ধারাই সম্পূর্ণ বদলে গেল মায়ের আসার পর থেকে।...মা এসে শ্রীঅরবিন্দকে স্থাপন করলেন মহাযোগেশ্বরের উচ্চ বেদিতে।...মা তাঁর বাক্যে, ভাবে, প্রত্যক্ষ আচরণের দ্বারা আমাদের শিখিয়ে দিলেন যে গুরু ও শিষ্যের প্রকৃত অর্থ কি—যা তিনি মুখে বলতেন তা কাজে দেখিয়ে দিলেন। মা কখনও শ্রীঅরবিন্দের সামনাসামনি বা তাঁর সঙ্গে এক সমতলে বসতেন না; তিনি নীচে বসতেন মাটিতে; দেখিয়ে দিতেন

যে কেমন করে গুরুকে শ্রদ্ধা করতে হয়, যথার্থভাবে কেমন শিষ্টাচার করতে হয়।....

শ্রীমায়ের ভারতীয় শাস্ত্রের অভিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—"আমরা জেনে আরও আশ্চর্য হ'লাম যে ফ্রাঁন্সে থাকতেই মা ভারতীয় শাস্ত্র—গীতা, উপনিষদ, যোগসূত্র এবং নারদের ভক্তিসূত্র সমূহ পাঠ করেছেন ও তার অনেকগুলি অনুবাদও করেছেন।

শ্রীকে, ডি, শেঠনা সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন—"মা থাকতেন অতি সাদাসিদে ভাবে। তুটি তিনটি সাধারণ শাড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না, তাও তিনি নিজে কাচতেন। এমন কোন কাজ ছিল না যাতে তিনি নিজে হাত না লাগাতেন। কোন কাজকে তিনি তাঁর পক্ষে হীন মনে করতেন না। কিন্তু যা কিছু করতেন সমস্তই প্রাণ দিয়ে সুন্দরভাবে করতেন এবং তার মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক তাৎপর্য থাকত, কারণ তাঁর সমগ্র সত্তার মধ্যেই সব সময় সাধারণ ভাব ছাড়া একটা সক্রিয় আভ্যন্তরীণ চেতনার গভীরতা থাকত।"

মা সকলকে দেখালেন কিভাবে প্রতি জিনিসের প্রতি দরদ দিয়ে দেখতে হয়—তাঁর কাছে কোন জড় জিনিস কেবল জড় মাত্রই নয়, প্রত্যেক জিনিসেরই নিজস্ব সত্তা ও চরিত্র আছে—প্রত্যেকের ভেতরই চেতনা আছে এবং তাতে সে সাড়া দেয়।

মায়ের আগমনের পূর্বে কয়েকজন মাত্র ভক্ত অনুরাগী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে। আর্থিক সঙ্গতির অভাবে তাঁদের বহুবিধ কৃচ্ছ্রসাধন করে চলতে হোত, এমন কি শ্রীঅরবিন্দকেও বহুবিধ অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে কাটাতে হোত। মা এসে আস্তে আস্তে সমস্ত অবস্থার একটা সার্বিক পরিবর্তন সাধন করতে থাকলেন। প্রথমে তিনি আশ্রমের ভিতরে বাহিরে শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যের পরিবেশ গড়ে তুললেন, বললেন—"এই আশ্রমে বসে শুধু ধ্যান করলেই চলবে না—সকলকে এখানকার কিছু না কিছু কাজও করতে হবে। এই আশ্রমটিকে সকলে মিলে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর ক'রে গড়ে তুলতে

হবে। সে কাজও ভগবানের কাজ, তাঁকে স্মরণ করে নিঃস্বার্থ ও নিরাসক্ত ভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সে কাজ করতে থাকলে তাতেও ভগবানকে সাধনা করা হবে। কেবল জ্ঞান যোগই যোগ নয়, কর্মযোগও যোগ।"

শ্রীমা আরও বললেন—

"জীবনের প্রতি ও জগতের লোকের প্রতি বীতরাগ হয়ে তার থেকে সরে আসতে যারা চাইছে—তাদের জন্য এই যোগ নয়। বাধা বিপত্তির হাঙ্গামা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে যে এখানে ছুটে আসতে চায় তার জন্যও নয়। এমন কি ভগবানের স্নেহ ও শরণ পেয়ে যারা জীবনের মাধুর্য খোঁজে তাদের জন্যেও এ স্থান নয়, কারণ সেরূপ শরণ নেবার মনোভাব থাকলে সর্বত্রই তা মিলতে পারে। কিন্তু ভগবানের সেবাতে যে কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে চায়, ভগবানের কাজেই যে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদিত করে দিতে চায়, কেবল আত্মদান ও সেবারই আনন্দে, তার প্রতিদানে কোন কিছু কামনা না করে কেবল নিবেদন ও সেবা করার সম্ভাবনাতেই যে খুসী, সেই এখানে আসার পক্ষে উপযুক্ত হয়েছে এবং তার জন্যে এখানকার দ্বার সর্বদা অবারিত।"

মায়ের কথা—প্রার্থনা করতে করতেও যেন আমরা কাজ করি কারণ কাজই হ'ল ভগবানের কাছে দেহের দ্বারা সর্বোত্তম প্রার্থনা।

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মা বললেন—"জ্ঞান দীপ্তিতে দেহ ও বাহ্য জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, তার জন্যে বিশেষ কোন কাজও হয় না, তাতে জগত যেমন আছে তেমনই থেকে যায়। বস্তুতঃ বরাবর তাই-ই হয়ে এসেছে। এমনকি যাঁরা প্রভূত পরিমাণে উচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁরাও জগত থেকে সরে গিয়ে নির্বিরোধ আভ্যন্তরীণ শান্তির মধ্যে থাকতে চেয়েছেন, আর জগত যেমন অন্ধকার দুর্দশার মধ্যে কষ্ট পাচ্ছে তেমনি ভাবে তাকে থাকতে দিয়েছেন। মৃত্যু ও অজ্ঞানতা যেমনভাবে এই পার্থিব স্তরে রাজত্ব করছিল তার কিছুমাত্রও ব্যতিক্রম

হয় নি।...এমন আদর্শ যাদের কাম্য তাদের পক্ষে এটা ভাল হতে পারে, কিন্তু আমাদের যোগের সে আদর্শ নয়। আমরা চাই এই জগতকে সকল দিক দিয়ে গ্লানিমুক্ত করে দিব্যভাবে জয় করতে, এর সকল রকম তৎপরতাকে উন্নত করে এখানেই ভগবানের দিব্য বিকাশ ঘটাতে।"

শ্রীঅরবিন্দও ঠিক এই কথাই বলেছেন—"আমার কাজ এই অপূর্ণ পার্থিব জগতকেই নিয়ে, অন্য কোন জগতের প্রয়োজনে নয়, আমি চাই এই পার্থিব জগতেরই মধ্যে দিব্য উপলব্ধি আনতে, অন্য কোন সুদূর চূড়াতে উত্তীর্ণ হতে নয়।"

শ্রীঅরবিন্দ এক পত্রে লিখলেন—"এ আশ্রম অন্য কোন আশ্রমের মত নয়—এখানকার অধিবাসীরা কেউ সন্ন্যাসী নয়; এখানকার যোগের লক্ষ্য কেবল মোক্ষ লাভই নয়। এখানকার সাধনা হ'ল এমন এক কাজের জন্য প্রস্তুতি—যে কাজ কেবল যোগ চেতনা ও যোগ শক্তির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হবে, তার অন্য কোন ভিত্তি থাকবে না।"

"দিব্যজীবনে" শ্রীঅরবিন্দের যোগের উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়েছে—শ্রীমা নিজে তাকে বাস্তবে রূপায়ন করার কাজে সহায়ক হয়েছেন—ভক্ত শিষ্যদের ভার তিনি নিজেই নিয়েছেন—ভক্ত অনুরক্ত জনের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে—শ্রীমা-ই তাঁদের অধ্যাত্ম সাধনার পূর্ণ সহায়—আশ্রমের পরিধি ক্রমেই বাড়তে থাকে—এক পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানরূপে একে গড়ে তোলেন শ্রীমা তাঁর অপূর্ব, অনবদ্য দিব্য কর্মধারা ও নিষ্ঠার সঙ্গে।

শ্রীমা তাঁর সকল কাজকেই ঈশ্বর নির্দিষ্ট কাজ বলে সারা জীবনই গ্রহণ করেছেন, এ কাজও তাই। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখলেন —"ঈশ্বর নির্দিষ্ট কাজের সঙ্কল্প আমার কখন এল একথা বলা কঠিন—কারণ আমার মনে হয় ঐ নিয়েই আমি জন্মেছি এবং মন ও বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ চেতনাও স্পষ্টতর হতে ও সম্পূর্ণতা লাভ করতে থাকে।"

১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্বর সিদ্ধি দিবসের পরে শ্রীঅরবিন্দ গভীরতম সাধনার জন্য একেবারে অন্তরালে চলে গেলেন। আশ্রম পরিচালনা, ভক্তশিষ্যদের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, তাদের ধ্যান ধারণা, কাজের মাধ্যমে সাধনা পরিচালনা প্রভৃতি সব কাজই শ্রীমা নিজের হাতে তুলে নিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর অতিমানসের একাগ্র সাধনায়—পৃথিবীর চেতনার রূপান্তরের যোগে—পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগের সুযোগ ও সুবিধা করে দিলেন।

একদিকে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের তপৈশ্বর্যের বিভূতি ছড়িয়ে পড়েছে—আবার অন্যদিকে আশ্রমের অধ্যাত্ম কর্মশালায় মায়ের অনবদ্য পরিচালনায় ভক্ত শিষ্যজনের জীবন্ত, প্রাণবন্ত পূর্ণ যোগ সাধনা মূর্ত হয়ে উঠে আশ্রমকে নিত্য নবরূপে রূপায়িত করার কাজে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

এরই মধ্যে অধিমানসের অবতরণের ন-দশমাস পর থেকে আশ্রমে নানা আধ্যাত্মিক ঘটনা ঘটতে আরম্ভ হ'ল—যা, তখন যাঁরাই আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই জানেন। ঐ সকল ঘটনা প্রচার হ'লে রীতিমত একটা সাড়া পড়ে যেত—হয়ত গড়ে উঠ্‌ত এক নূতন অধ্যাত্ম পথ—কিন্তু যার জন্যে এর ছেদ পড়ল তা আরও বিস্ময়কর।

এই সময়ে একদিন মায়ের ধ্যানের ভিতরে নেমে এল এক বিরাট শক্তি—মা যাকে বর্ণনা করেছেন—"সৃষ্টির নাদ বা ধ্বনি" (Word of Creation) রূপে—যেমন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁর নাদের ভিতর দিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেছেন। মায়ের নিকট সৃষ্টির ধ্বনি পৌঁছানতে, অপরূপ সৃষ্টির এক নূতন জগত গড়ে তোলার, এক দেব-মানব জগত বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার ক্ষণ এসে উপস্থিত হ'ল।

মা ঐ ক্ষমতার অধিকারিণী হয়ে শ্রীঅরবিন্দের ঘরে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন—"আমি সৃষ্টির নাদধ্বনির অধিকারিণী হয়েছি।"

শ্রীঅরবিন্দ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—"এই ধ্বনি আসছে অধিমানস থেকে—আমরা তা চাই না—আমরা চাই এক অতিমানস

জগত গড়ে তুলতে।"

মা নিঃশব্দে তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন। দু ঘণ্টা তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে রইলেন এবং ধ্যানের শেষে সম্পূর্ণভাবে সমস্ত জগতের সম্ভাবিত নূতন সৃষ্টিকে লয় করে দিলেন।

এতবড় শক্তির অধিকারিণী হয়ে তা কেউ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে পারে এমন ঘটনা জগতের ইতিহাসে বিরল—এ কেবল মায়ের মত পরিপূর্ণ সমর্পিত আত্মার পক্ষেই সম্ভব। তিনি এ কাজ করলেন কারণ শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে তাঁর ও মায়ের পক্ষে উচ্চতম দিব্য সত্যের আদর্শের ন্যূন কোন কিছুই বরণীয় নয়।

আশ্রমের সাধকদের সাধনার ভার মা পুরোপুরি গ্রহণ করলেন—শ্রীঅরবিন্দের তাতে পূর্ণ সম্মতি ও সমর্থন থাকল, তিনি বললেন—"মা-ই সাধনা করেন প্রত্যেক সাধকের অন্তরে, কেবল এ নির্ভর করে সাধকের উন্মুখতা ও গ্রহিষ্ণুতার ওপরে।"...

মায়ের এখানে উপস্থিত থাকার জন্যে যে আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে সে কথাতে তিনি বললেন—"খুব কম সাধকই এ অনুধাবন করতে পারে—আর যারা তা পারে তারাও এই সুযোগের খুবই কম সদ্ব্যবহার করতে পারে।"

শ্রীঅরবিন্দ এক ভক্তকে লিখলেন—"মায়ের ও আমার চেতনা একই—কারণ লীলার জন্যে তাই-ই প্রয়োজন—এক দিব্য চেতনা দুজনের ভিতরেই। তাঁর জ্ঞান ও শক্তি ভিন্ন, তাঁর চেতনা ভিন্ন কিছুই করা যাবে না—যদি কেউ তাঁর চেতনাকে অনুভব করতে পারে তার জানা উচিত যে আমি সেখানে আছি তার পশ্চাতে।"

অপর এক পত্রে তিনি লিখলেন—"মা ও আমাকে সব পথ পরিক্রমা করতে হয়েছে...যুদ্ধ করতে হয়েছে, আঘাত সহ্য করতে হয়েছে, দুর্গম মরুভূমি ও জঙ্গল পার হতে হয়েছে—আমার বিশ্বাস আমাদের পূর্বে এত কঠিন কাজ আর কাউকে করতে হয়নি।"

অন্য আর একজনকে তিনি লিখলেন—"আমাকে সবই করতে

হয়েছে—মাকে তার দশগুণ বেশী করতে হয়েছে···এই পথ অন্যদের পক্ষে সোজা করার জন্যে আমরা এই কষ্ট করেছি। এই উদ্দেশ্যেই মা এক সময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে ঐ পথে যেতে যে কোন অসুবিধা, বিপদ, কষ্ট প্রয়োজন তা তাঁর উপরই যেন বর্তায়। বছরের পর বছর মায়ের অক্লান্ত সাধনার ফলে এই হয়েছে যে যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস ন্যস্ত করেছে, নির্ভর করেছে, তারা ঐ সূর্যালোকিত পথের সন্ধান পেয়েছে—তাদের সাধনা সহজ, সরল হয়েছে।"

একজন শ্রীঅরবিন্দকে প্রশ্ন করলেন—মায়ের আসাতে আপনার কাজে ও সাধনায় সাহায্য হয়েছিল? উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বললেন—"নিশ্চয়! নিশ্চয়! আমার সকল উপলব্ধি, নির্বাণ ও আর সব কিছু, বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তত্ত্ব কথাতেই থেকে যেত—মা-ই তার বাস্তব পথ দেখিয়ে দিলেন কি করে কাজে তা রূপায়িত করা যায়। তিনি না এলে কোন পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ সম্ভব হোত না। তিনি এই রকম সাধনা ও ক্রিয়া তাঁর ছেলে বয়স হতেই করেছেন।"

প্রথম প্রথম সাধকের সংখ্যা কম ছিল—মা প্রত্যেকের কথাই ব্যক্তিগত ভাবে স্মরণে রাখতেন—যার যেমন প্রয়োজন তার সমাধান তিনি নিজেই করে দিতেন। প্রত্যহই প্রণামের পূর্বে সাধকেরা মায়ের সঙ্গে বসে ধ্যান করতেন—তাতে তখন অনেকেরই মনে হোত যেন একটা দিব্য শক্তি তাদের দেহে প্রবেশ করছে—আর তার ক্রিয়া সারাদিনই থাকত। ঐ ধ্যানের সময়ে নানা জনে নানাভাবে অনুভূতি পেতেন। একজন লিখলেন—"প্রণামের স্থানে ধ্যানের সময় তিনি দেখলেন যে আকাশ নীল আলোতে ভরে গেছে, তার ভিতর দিয়ে এক সুন্দর পথ রচিত হয়েছে, আর মা সেই পথ দিয়ে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নেমে আসছেন। মায়ের দেহ শুভ্র ও স্বর্ণালোকিত, তার থেকে উজ্জ্বল স্বর্ণচ্ছটা চাতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি যখন পৃথিবীতে নেমে এলেন তখন তাঁর দেহ পৃথিবীর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল।"

অপর একজন বললেন—"আজ যখন মায়ের কাজ করছিলা

তখন এক শান্ত তেজ অনুভব করলাম—মাথায় যেন ঠাণ্ডা হিমস্পর্শ পেলাম। ভেতরে জ্ঞান নেমে এ'ল ও দেখলাম যে যদিও মা দেহে উপস্থিত নেই কিন্তু তিনি সর্বদাই সর্বত্র আমাদের ঘিরে রয়েছেন ও তাঁর স্নেহ হস্ত বুলিয়ে আমাদের সব দুঃখ কষ্ট দূর করছেন।"

আরও অন্য একজন বললেন—"গত একপক্ষ কাল ধরে যখনই আমি মাকে প্রণাম করেছি তখনই মায়ের স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে শক্তি ও আনন্দ লাভ করছি—যেন কোন এক নতুন জিনিস আমার ভেতর ঢেলে দেওয়া হচ্ছে।"

এইরূপে বহুজনের বহু রকমের অভিজ্ঞতা আসতে থাকে এবং সাধকদের সাধনা এগিয়ে চলে—সকলেই ধ্যান সাধনায় আশাতীত সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকেন।

এমনই এক সময় এলেন কাব্যকণ্ঠ গণপতি শাস্ত্রী—গণপতি মুনি নামেই তিনি সারা দক্ষিণভারতে ছিলেন সমধিক পরিচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য। মাত্র দশ বছর বয়সেই তিনি লিখেছেন সংস্কৃত ভাষায় সুললিত কবিতা আর সেই বয়সেই তিনি পারদর্শিতা লাভ করেছেন সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাকরণে। বার বছর বয়সে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচনা করেছেন ভৃগু সন্দেশ। চৌদ্দ বছর বয়সে লাভ করেছেন পঞ্চতীর্থ উপাধি। শক্তি সাধনার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহন করেন তিনি—তপস্যালব্ধ শক্তি সঞ্চয় দ্বারা পৃথিবীর কল্যাণ করবেন এই অভিলাষ তিনি চিরদিনই পোষণ করেছেন। সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও সাধক শ্রীকপালী শাস্ত্রী তাঁর শিষ্য ছিলেন—তিনি এবং মুনির অন্যান্য শিষ্যভক্তবৃন্দ মুনিকে "নয়ন" (পিতা) বলে সম্বোধন করতেন। শ্রীশাস্ত্রী ১৯২৮ সনে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের দর্শনে আসেন। ১৭ই আগষ্ট তিনি মায়ের সঙ্গে ধ্যানে বসেন—ধ্যানের অভিজ্ঞতায় তিনি বললেন—সাধারণতঃ ধ্যানে তিনি মাথার ওপর থেকেই প্রবাহ অনুভব করেন, কিন্তু মায়ের সঙ্গে ধ্যানে বসে অনুভব করলেন সর্বদিক হতেই বিদ্যুত প্রবাহ বা স্পন্দন তাঁর

শরীরে প্রবেশ করছে। শ্রীমা-ও বললেন গণপতির ধ্যান সার্থক হয়েছে—একটানা কোনরূপ ব্যত্যয় না হয়ে তা আধঘণ্টা ধরে চলেছে —অপর কারো পক্ষে তাঁর সঙ্গে এত অধিক সময় ধরে ধ্যান করতে পারা সম্ভব নয়।

শাস্ত্রী ১৯শে আগষ্ট মায়ের সঙ্গে ৪৫ মিনিট ধরে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন তাঁর বোধিতে তিনি শাকম্বরী ও যোগেশ্বরী দেবীকে দেখেছেন—এবং যে মুহূর্তে তিনি মাকে দেখেছেন সেই মুহূর্তেই তিনি তাঁকে শাকম্বরী দেবী বলে চিনতেও পেরেছেন। তিনি নিজেও গণপতির অবতার, শাকম্বরীর পুত্র, আর সেই জন্যই তিনি এই মায়েরই ছেলে।

মা পরে গণপতিকে বললেন তোমার এ দর্শন কেবলমাত্র বোধিজাতই নয়, পরন্তু, এ তোমার এক দিব্য উদ্ঘাটন (Divine Revelation)।

যখন শাস্ত্রী শাকম্বরী তত্ত্বের কথা বলছিলেন তখন তিনি লক্ষ্য করলেন মায়ের চোখ বুজে এল ভাব-সমাধিতে এবং অকস্মাৎ তিনি একেবারে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। শাস্ত্রী দেখলেন মায়ের সর্ব অঙ্গ হতে উজ্জ্বল আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে ও তাঁকে ঘিরে এক জ্যোতিঃপুঞ্জ-বলাকার সৃষ্টি হয়েছে আর তাঁর বোধে এল যে সমস্ত ঘরটি যেন বৈদ্যুতিক প্রভায় ও শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

ধ্যান ও প্রার্থনার পর মা প্রত্যহ প্রত্যেককেই আশীর্বাদ করতেন ও একটি করে ফুল দিতেন—মায়ের প্রত্যেকটি ফুলেরই বিশেষ তাৎপর্য থাকত। এক এক রকমের ফুল সাধকের চেতনায় এক এক বিশেষ স্পন্দনের সৃষ্টি করত—যার যেটি প্রয়োজন মা তাকে ঠিক সেই ভাবেই এগিয়ে নিয়ে যেতেন।

একজন শ্রীঅরবিন্দকে প্রশ্ন করে লিখেছিলেন—প্রত্যেক দিন প্রণামের পরে মায়ের ফুল দেওয়ার তাৎপর্য কি ?

শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে লিখলেন—"ফুল যার প্রতীক সেই জিনিসের

উপলব্ধিতে তা সাহায্য করবে বলে।"

অপর একজন প্রশ্ন করলেন—ফুল কি শুধু প্রতীক—অন্য কিছু নয়? ফুল কি নীরবতার প্রতীক হতে পারে? অর্থাৎ একি নীরবতা উপলব্ধি করাতে পারে?

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন—"যখন মা ঐ ফুলের ওপর তাঁর শক্তি প্রয়োগ করেন তখন তা প্রতীকের চেয়ে বেশী কিছু হয়। তখন সেই ফুল যে গ্রহণ করে তার যদি গ্রহিষ্ণুতা থাকে তাহলে তা খুবই কার্যকরী হতে পারে।"

প্রণামের পর চলত দেখা সাক্ষাতের পর্ব, এবং তা চলত মধ্যাহ্ন পর্যন্ত। ধ্যানের পর কখনও কখনও মা তাঁর ধ্যান ও প্রার্থনা হতে পড়ে শোনাতেন।

একজন বিদেশী মহিলা এসে আশ্রমের সর্বময়ী কর্ত্রী হবেন—পুরানো আশ্রম-বাসীদের মধ্যে প্রথম প্রথম কেউ কেউ এটা ভাল চোখে দেখেন নি। কিন্তু মা তাঁর অসাধারণ ধৈর্য, ধী, স্নেহ, মমতা ও তপস্যার আলোকে সবাইকে জয় করে নিলেন—সকলেই মায়ের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে আশ্রমের সকল সমস্যার সমাধানে ব্রতী হলেন।

এ বিষয়ে বেশ সুন্দর একটা কাহিনী শ্রীদিলীপ কুমার রায় তাঁর "Sri Aurobindo came to me" বইতে বর্ণনা করেছেন—

"একবার আমার মনে হ'ল মা আমার সম্বন্ধে খুব অবিচার করছেন—আমি রেগে মাকে বলে পাঠালাম, তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই—শ্রীঅরবিন্দকে বেশী শ্রদ্ধা করি বলেই বোধহয় তিনি আমার উপর অখুসী—আরও বললাম যে, শ্রীঅরবিন্দের জন্যই এখানে এসেছিলাম—মায়ের জন্য নয়। শ্রীঅরবিন্দকেও সেই কথা লিখে জানালাম। মাকে আরও লিখে পাঠালাম যে, আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত—তবে শ্রীঅরবিন্দ বললেই যাব—মায়ের হুকুমে নয়।

এর পরে শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত এসে বললেন যে মা ডাকছেন। শুনেই আমি চটে উঠে বললাম—তাঁর রাগের ধারধারি না, ডাকলেও

যাব না। তিনি বললেন, তুমি ভুল বুঝেছ—মা অনুযোগ করতে ডাকছেন না—না গেলে অভদ্রতা হবে। অগত্যা মায়ের কাছে গেলাম। মা আমার দিকে চেয়ে কেবল একটু হাসলেন, কিন্তু সে এমন হাসি যে মা ছাড়া আর কেউ তেমন হাসতে পারে না—আমি অবাক, আশা জাগল তাহলে হতাশ হবার কিছু নেই—সঙ্গে সঙ্গে বোধে এলো ঐ হাসিটুকুর ওপর আমার কতটা নির্ভর ছিল—আমি তাঁর সামনে মেঝেতেই বসে পড়লাম। মায়ের চোখ দিয়ে তখন এক অপূর্ব আলো ছড়িয়ে পড়েছে—তার ভেতরে যেন শক্তি, মমতা ও সমতা এক হয়ে রয়েছে—মা আমার কাঁধের ওপরে হাত রেখে বেশ সহজভাবেই বললেন—"আচ্ছা তুমিই বলতো, যে শ্রীঅরবিন্দকে এতটা ভালবাসে আমি কি কখনও তার ওপরে রাগ করতে পারি? আমার সব কিছু দিয়েই তো তাঁকে খুসী করার জন্যে এখানে থাকা—আর তোমরাও তো সব ছেড়ে সেই জন্যই এখানে রয়েছ।"

মা হয়তো আরও কিছু বলতেন—কিন্তু আমার চোখে জল দেখে থেমে গেলেন। সেই দিন আমি এক নতুন চোখে দেখতে পেলাম খাঁটি আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধা থাকলে মানুষ কত নম্র হতে পারে—সেই দিন থেকে মাকে আমার অধ্যাত্ম জীবনে প্রকৃত মা বলে স্বীকার করে নিলাম।

মায়ের সামনে যে একবার এসেছে, তা স্থায়ী ভাবেই হোক আর ক্ষণিকের জন্যেই হোক, মায়ের প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির স্পর্শ সে পাবেই—মা তাঁর অন্তঃস্পর্শী দৃষ্টি দিয়ে তার অন্তরে স্থান করে নেবেনই—শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, ভালবাসায় সে একান্তভাবে মায়েরই হয়ে যাবে।

প্রাক্তন আই, সি, এস ও এককালীন শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক সহায়ক ও পরে ভক্ত শ্রীচারু চন্দ্র দত্ত এ সম্বন্ধে তাঁর বেশ এক সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন—

"...আশ্রমে আমি মায়ের নিকট অপরিচিত ছিলাম, তাঁর ভক্তদের

ও অন্যান্যদের কাছ থেকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছিলাম, কিন্তু লোকে যা বলত আমি তাতে কান দিতাম না। অবশ্য এটা বেশ বোঝা যেত যে তিনি ব্যক্তিত্ব ও শক্তি সম্পন্না মহিলা। আমি এর পূর্বেও ব্যক্তিত্ব সম্পন্না ইউরোপীয় মহিলা, মিসেস এনি বেশান্ত, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতির সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু তাঁদের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করার কোন প্রশ্নই মনে ওঠে নি। পণ্ডিচেরীতে মায়ের একেবারে সামনা সামনি না হওয়া পর্যন্ত এ সমস্যা আমার মনে উদয় হয়নি। যখন সমস্যা এল আমার প্রভু নিজে তাঁর অশেষ করুণাবলে তার সমাধানও করে দিলেন—নাহলে আরম্ভেই আমার যোগের পরিসমাপ্তি ঘট্‌ত। ঐ সব দিনে দর্শনের সময় মা সকলকে :আশীর্বাদ করতেন। সকলের সঙ্গে সেদিন আমিও ধ্যান ঘরে সারিতে দাঁড়িয়েছি। একেবারে শেষ মুহূর্তে আমার মনে চিন্তা এল—'আমি যদি এই ইউরোপীয় মহিলার পাদস্পর্শ করে প্রণাম না করি তাহলে কি হবে? তখনই আমি স্থির করলাম যে আমি কপট আচরণ করব না—যদি আমার পা স্পর্শ করতে ইচ্ছা না হয় তাহলে আমি দুহাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে শুধু নমস্কার করব এবং তার পরেই আশ্রমে ফিরে মাকে লিখব—শ্রদ্ধাস্পদা মা, আশ্রমের শৃঙ্খলা রাখতে অক্ষম হয়েছি সেজন্য আমি পণ্ডিচেরী ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।' আমার প্রভু এবারও আমাকে রক্ষা করলেন—যে মুহূর্তে মায়ের জ্যোতির্ময় পাদুখানি দেখেছি সেই মুহূর্তেই নিজের অন্তরে চিৎকার করে বলে উঠলাম—নির্বোধ! নির্বোধ! তুমি এই শ্রীপাদপদ্মকে মানুষের বলে মনে করেছিলে? আর তখনই শ্রদ্ধাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়লাম সেই শ্রীচরণ-কমলে—তৎক্ষণাৎ আমার সমস্ত দেহের ভিতর দিয়ে এক শক্তিশালী স্পন্দন তড়িৎ গতিতে বয়ে গেল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে মায়ের দেবত্বের প্রশ্নের মিমাংসা হয়ে গেল।"

ওঁদের মত ভক্ত সাধক না হলেও এই লেখকের অভিজ্ঞতার কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না—১৯৫৯ সনে বোম্বাইয়ে সারাভারত-

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের সভাপতির কাজ সেরে সহধর্মিনী শান্তি সহ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে আমি প্রথমেই এসে পৌছিলাম পণ্ডিচেরীতে। পরদিন সকালে সারিবদ্ধ হয়ে মাকে ব্যাল্‌কনিতে দর্শন করলাম। কর্তৃস্থানীয় একজন বললেন মায়ের কাছে গিয়ে দর্শন করবেন না? আমার সমস্ত ভ্রমণসূচী ছকে বাঁধা—সেজন্য বললাম আজই হলে পারি—কিন্তু তিনি জানালেন দুদিন অপেক্ষা করতে হবে—তৃতীয় দিনে সাক্ষাৎ হতে পারে। সহধর্মিনী বললেন দুদিনই অপেক্ষা করব—মায়ের পায়ে প্রণাম না করে যাব না—অগত্যা তাই থাকতে হোল। মনের মধ্যে মায়ের প্রতি বিমুখতা ছিল—তিনি ইউরোপীয়, তিনি টেনিস খেলেন প্রভৃতি কারণ—আসল কথা, কিছুই জানতাম না তাঁর সম্বন্ধে। আমি বললাম—আমি কিন্তু মাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব—তাঁরা বললেন—হাঁ করবেন। নির্ধারিত দিনে ও সময়ে এই মন নিয়ে মায়ের নিকট উপস্থিত হয়েছি সঙ্গে সহধর্মিনী। মায়ের সামনে এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে তাঁর দিকে চেয়েছি—মা আশীর্বাদী ফুল হাতে দিয়ে তাঁর অভ্রভেদী দৃষ্টিতে আমার চোখে নিবদ্ধ করলেন তার স্বর্গীয় দুটি চোখের দৃষ্টি—মনে হ'ল এক অত্যন্ত শক্তিশালী আলোক রশ্মি মায়ের চোখ হতে নির্গত হয়ে আমার দুই চোখের ভিতরে এসে প্রবেশ করল—আমি সম্বিৎ হারিয়ে ফেললাম—বিশ্বজগত তখন আমার নিকট বিলুপ্ত হয়েছে—বোধ, জ্ঞান সব কিছুই তখন হয়েছে অন্তর্হিত—তন্ময় হয়ে নির্নিমেষ নয়নে আমি চেয়ে আছি মায়ের চোখে চোখ রেখে অপলক দৃষ্টিতে—কোথার প্রশ্ন তখন কোথায় তলিয়ে গেছে—বিশ্ব সংসার তখন একাকার!

এবারে শান্তির প্রণামের পালা—তিনি লুটিয়ে পড়ে মায়ের পায়ে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত—গভীর ভক্তিতে, অনুরাগে, শ্রদ্ধায় তাঁর দেহ শিহরিত—মায়ের পরম আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে এসেই বললেন, দেখছ না, ইনিই আমাদের সত্যকারের মা—বাপের বাড়ী এলে মা যেমন করে আদর করেন, মেয়েকে কাছে ডেকে নেন্—ঠিক সেই ভাবেই মা

ডেকে নিলেন—স্নেহ দৃষ্টিতে সারা অন্তর ভরিয়ে দিলেন—মাকে আর একক্ষণের জন্যও ভুলব না—আর কোন গুরু, আর কোন ঈশ্বর আমার নেই—জীবনের শেষদিন শেষক্ষণ পর্যন্ত এই মা-ই আমার পরম গুরু—ভগবান। ঠিক হয়েছিলও তাই, তার শেষের দিনে মা তাকে কাছে ডেকে নিয়ে তাঁর দিব্য আশীর্বাদে তার অন্তর ভরিয়ে দিয়েছিলেন।

এই রকম কত শত সহস্র অন্তর মা ভরিয়ে রেখেছেন তাঁর বিশ্বজয়ী দেবদুর্লভ নয়ন-জ্যোতিঃতে শান্তির পরশ বুলিয়ে—সমৃদ্ধ করেছেন সকলের অন্তর দেশ—ভগবদ অনুপ্রেরণা লাভে ধন্য হয়েছেন সবাই—এগিয়ে চলেছেন সেই এক পরমের উদ্দেশে জীবন পথে।

৯

মায়ের পত্র

ভগবানের কাছে ঐকান্তিক আত্মোৎসর্গের মধ্যে রয়েছে আমাদের যত মানুষী কষ্টের প্রতিকার।

শান্তি হবে বিশাল, স্তব্ধতা গভীর অটল, স্থিরতা অচঞ্চল, আর ভগবানে নির্ভর নিত্য বর্ধিষ্ণু। নদী যেমন চলে সাগরের দিকে, আমাদের সকল চিন্তা, সকল অনুভব তেমনি চলবে ভগবানের দিকে।"

—শ্রীমা

সাধক সাধিকাদের পত্রের উত্তরে শ্রীমা সাধন বিষয়ে উপদেশ দিয়ে যে সকল পত্র লিখেছেন তার মধ্য হতে কিছু কিছু সঙ্কলন করে এখানে সন্নিবেশিত হ'ল। সাধনার সময়ে সাধকদের মনে সাধারণতঃ যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় তার অধিকাংশেরই সমাধান এই সকল পত্রের মধ্যে পাওয়া যাবে এবং তা যোগ ও সাধনার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে :

[১]

তুমি জানতে চেয়েছ যে কখন আমি প্রার্থনা করি, তাহলে তুমিও তখন তাতে যোগ দিতে পার। কিন্তু দেখ আমার প্রার্থনা বা ধ্যানের তো কোন নির্দিষ্ট সময় নেই—যখন যা কিছু কাজেই ব্যস্ত থাকি, দিনে ও রাতে, সকল সময়ই এই দেহটা পরম প্রভুর নিকট নিবেদন জানাচ্ছে যে এই মিথ্যার জগতে অভিব্যক্ত হোক তাঁর পরম সত্য, এই অসঙ্গতির রাজ্যে প্রকাশিত হোক তাঁর দিব্য প্রেম। সুতরাং, যে কোন সময় তোমার প্রার্থনা করতে মন হবে তখনই করবে, তা আমার প্রার্থনার সঙ্গে যুক্ত হবে।

দ্বিতীয় কথা, তুমি বলেছ যে লোকেরা প্রার্থনা করলেই পরম প্রভু তাদের দিয়ে থাকেন ধন সম্পদ, পুত্র কন্যা, পার্থিব সুখ—ঠিক কথা, কিন্তু এগুলি হ'ল স্থূল চেতনার অন্তর্গত কাম্য, এগুলির জন্য কোন প্রস্তুতির দরকার হয় না, যে যেমন অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই এ সব জিনিস তারা গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু যখন তুমি চাইছ সর্বাপেক্ষা যা বড় জিনিস আর কঠিন

জিনিস, অর্থাৎ দিব্য সত্যকে—তখন তা গ্রহণ যোগ্য হবার জন্যে তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে—তাকে দেখতে পাওয়া এবং অনুভব করার জন্যে বড় রকমের প্রস্তুতি দরকার। প্রকৃতপক্ষে সে সত্য আমাদের সঙ্গেই আছে। তবুও যে তাকে আমরা দেখি না ও অনুভব করতে পারি না, তার কারণ আমাদের সে সামর্থের অভাব—তাতেই হচ্ছে বিলম্ব। প্রার্থনা ঐকান্তিক হলে প্রভু তৎক্ষণাৎ সাড়া দেন, কিন্তু সামর্থের অভাবে আমরা সে কথা জানতে পারি না।

[২]

যখন নিজের গভীর অন্তরে স্পষ্ট করে জানবে যে সেখানে তুমি বন্ধন শূন্য, তুমি সকল মানুষের ও সকল ঘটনার দ্বারা অপ্রভাবিত, শোক বা বিরাগ বা ক্রোধ তোমাকে স্পর্শই করতে পারে না, তুমি সর্বদাই রয়েছ এক শান্ত ও নিস্তব্ধ সন্তোষের অবস্থাতে, তখনই জানবে তোমার আত্মার মুক্তি হয়েছে।

এ বোধটি অকস্মাৎও আসতে পারে আবার ক্রমশঃও আসতে পারে; আর অল্প বিস্তর সময়ের জন্য স্থায়ী হতে পারে—সমস্তই নির্ভর করে তোমার চেতনা কতখানি ও কত শীঘ্র শীঘ্র আত্মার সংস্পর্শ পাচ্ছে।

সে সংস্পর্শ সর্বক্ষণ থাকা চাই, কিন্তু সেরূপ অবস্থা একটু একটু করে পরে আসে, যখন তোমার সত্তার সকল অংশই বাইরের দিক থেকে আত্মার দিকে ফিরে দাঁড়ায়, স্থূল চেতনা ও স্থূল সত্তাও তারই ধারা নেয়।

এ পরিবর্তন তাড়াতাড়ি আনবার সেরা উপায় ভিতরের দিকে চলে যাওয়া। এই ভিতরের দিকে যেতে হলে আগে আরাম করে বসবে বা শুয়ে পড়বে, তারপর তোমার চেতনার সূত্রগুলিকে—যা চারদিকে ছড়িয়ে বাঁধা রয়েছে নানা ব্যক্তি ও আশপাশের নানা বস্তুর মধ্যে, যা কিছু তুমি চিন্তা কর বা যা কিছু তুমি করতে চাও ইত্যাদি ইত্যাদির মধ্যে—সবগুলিকে গুটিয়ে এনে তুমি একত্র জড়ো করবে।

এরপরে তোমার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে নেবে ভিতরের দিকে আপন বক্ষের গভীরতম প্রদেশে, আর সেই অবস্থাতেই থাকবে একাগ্র হয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা শান্তিপূর্ণ নিশ্চল অবস্থা আসে। প্রথম বারেই হয়ত এতে কিছু ফল পাবে না—কিন্তু পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করতে থাকলে তখন সাফল্য মিলবে। এমনি শান্ত, নীরব ও নিশ্চল থাকাতে তখন আত্মার সংস্পর্শ পাবে, এবং তার সঙ্গে মিলে মিশে নিজেকে মুক্ত বোধ করবে।

অবশ্য নিত্য অভ্যাস করতে থাকলে তবেই এ জিনিস সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে।

[৩]

আসল পন্থা হ'ল ভগবানে আত্মসমর্পণ—নিতান্তরূপে, সম্পূর্ণরূপে, বিনাসর্তে।

তা যদি করতে পার, প্রতিদান মাত্র না চেয়ে নিজেকে তাঁর হাতে একেবারেই সঁপে দিয়ে আপন চেতনাকে তাঁরই মধ্যে ডুবিয়ে দাও, তাহলে তোমার সকল দুঃখ কষ্টই ঘুচে যাবে—তবে সেই সমর্পণ হওয়া চাই সর্বতোভাবে খাঁটি ও সর্বশর্ত বর্জিত। তোমার যতকিছু কামনা বাসনা, যত কিছু প্রয়োজন বোধ, ভাল লাগা মন্দ লাগা, ইচ্ছা জাগা, অভাববোধ জাগা, আগ্রহ জাগা, অর্থাৎ যা কিছু নিয়ে তোমার ঐ ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব, তার সমস্তই ঘুচিয়ে বিনা হিসাবে যদি পুরোপুরি ভাবে নিজেকে নিবেদন করো তাহলে শান্তি পাবে নিশ্চয়, তখন যন্ত্রণা সব নিঃশেষ হয়ে যাবে।

[৪]

অধ্যাত্ম সিদ্ধির দিক থেকে সময়ের হিসাবের কোন বাস্তব মূল্য নেই; সব কিছু নির্ভর করে তোমার আস্পৃহার একাগ্রতা ও তীব্রতার ওপর, তোমার প্রয়াসের দৃঢ়তার ওপর। কারো বা কয়েক দিনের মধ্যেই সাফল্য মিলে যেতে পারে, কারো বা অনেক বছর লেগে যায়; আরও এক কথা, এ বিষয়ে উন্নতি আনার কাজ হ'ল মনের ও প্রাণের

তরফের ; আমাদের স্থূল দেহের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন দেহের ক্ষয় প্রাপ্তি ঘটতে থাকে তা কিন্তু সেখানে হয় না ; সুতরাং আধ্যাত্মিক উন্নতি ও জ্ঞানোদয়ের ক্ষেত্রে বয়সের প্রশ্নের কোন মূল্যই নেই, মনের উন্নতির কোন সময় সীমা কিম্বা বয়স সীমা থাকে না ; শত শত বছর ধরেও তা একই ভাবে অগ্রসর হতে পারে।

[৫]

অহং মনোভাব দূর করবার একমাত্র উপায় হ'ল আস্পৃহা ও প্রার্থনা ; সে আস্পৃহা যদি নিরবচ্ছিন্ন ও ঐকান্তিক হয় তাহলে ভগবান তাতে অবশ্যই সাড়া দেবেন।

ভগবানের প্রতি তোমার প্রেম ও আস্পৃহার তীব্রতায় যাবতীয় কামনা বাসনাকে ও বাধা বিপত্তিকে সম্পূর্ণ জয় করে ফেল।

[৬]

তোমার আত্মা সচেতন ও সক্রিয় রয়েছে তোমার দেহের মধ্যে, আর সেই আত্মার শক্তি হ'ল স্বয়ং ভগবানের শক্তি। অন্য যে কেউ তোমার দিকে অশুভ ইচ্ছা পোষণ করুক না কেন, সেই শক্তিই তোমাকে রক্ষা করবে।

[৭]

যোগ সাধনার দিক থেকে যদি দেখ তাহলে বাইরের কোন কিছুরই গুরুত্ব নেই জানবে। ভিতরে থাকবে অটল আর মনকে করবে অচঞ্চল, নিত্য আশ্রয় নিয়ে থাকবে ভগবানের মধ্যে, আর তাঁর সঙ্গে তোমার যা প্রকৃত সম্বন্ধ তাকেই দেবে গুরুত্ব।

[৮]

চেতনা যত বাড়তে থাকবে ঘুমের প্রয়োজন ততই কমে আসবে, কারণ তখনকার ঘুম হবে শান্তিপূর্ণ, চেতনা-যুক্ত ও বিশ্রামদায়ক, সুতরাং ঘুমের সময় যথেষ্ট কম হলেও তাতে কাজ হবে। কিন্তু ঘুম পেলেও যদি ঘুমের মাত্রা জোর করে কমিয়ে দাও তাতে ক্ষতি হবে, কারণ ওতে স্নায়ুর উপর উৎপীড়ন হতে থাকায় সেগুলি বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে।

[৯]

আমিতো হাজিরই আছি, নিজেকে কোথাও লুকিয়ে রাখিনি, কিন্তু আমার সন্তানেরাই এমন অন্ধ ও অচেতন যে তবুও তা দেখতে পায় না। তাদের প্রকৃত চোখগুলি ফুটলে তবেই তারা দেখতে পাবে, প্রকৃত চেতনা জাগলে তবেই তারা বুঝবে। আমার উপস্থিতি বোধ করতে যদি না পার, তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে কোন কুভাব বা সন্দেহ বা অবিশ্বাস তোমার মধ্যে ঢুকে রয়েছে, তাতেই তোমার চেতনাকে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে আমার উপস্থিতি লক্ষিত হচ্ছে না।

তোমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে কোন কিছুর দ্বারাই বিচলিত হতে দিও না, তাহলেই জানতে পারবে যে সর্বদাই আমি তোমার কাছে আছি।

[১০]

দিব্য জীবন যাপন করা কোন বাহ্য ক্রিয়া কলাপ বা বাহ্য ঘটনাবলীর ওপর নির্ভর করে না, এমন কি সর্বোচ্চ রকমের কাজ থেকে সর্ব নিম্ন নিতান্ত সাধারণ রকমের কাজ পর্যন্ত যাতেই তুমি নিযুক্ত থাক না কেন, দিব্যজীবন তাতেই লাভ করতে পারবে যদি সত্য চেতনাতে সত্য মনোভাব নিয়ে তুমি থাক।

[১১]

ঐকান্তিক হ'তে হ'লে সত্তার সকল অংশকেই একজোট হয়ে ভগবানের দিকে আস্পৃহাবান হ'তে হবে—এক অংশ চাইছে আর অন্য অংশ বিমুখ হচ্ছে, তা চলবে না।

আস্পৃহা আন্তরিক হ'তে হ'লে ভগবানকে চাইবে শুধু ভগবানেরই জন্যে, নাম বা যশ বা শক্তি বা মর্যাদা লাভ বা আত্মগৌরবের জন্য নয়।

আত্মনিবেদনে অবিচল ও অটুট শ্রদ্ধাবান থাকা চাই—এমন হ'লে চলবে না যে একদিন বিশ্বাস করলাম কিন্তু পরের দিন যেমনি ইচ্ছানুরূপ কাজ হ'লো না অমনি বিশ্বাসের পরিবর্তে সন্দেহ এসে পড়ল। সন্দেহকে আদৌ প্রশ্রয় দেবে না, ওর বিষ প্রতি বিন্দুতে

বিন্দুতে আত্মাকে ক্ষয়িত করতে থাকে।

বিনম্র হওয়া মানে আমি যে কি ও কেমন তা সঠিক ভাবে অনুধাবন করা, যতই কর্মিতকর্মা হওনা কেন তথাপি ভগবান যতটা প্রত্যাশা করেন তার তুলনায় সে যে কিছুই নয়, একথা কখনই ভুলে না যাওয়া। আর সর্বতোভাবে এটা অনুভব করা যে ভগবানকে ও তাঁর কার্যপ্রণালীকে বিচার করতে তোমার কোন ক্ষমতাই নেই।

কৃতজ্ঞ হওয়া মানে কখনই যেন না ভোলো যে ভগবানের কৃপা কতই আশ্চর্য যা তোমাদের প্রতিজনকেই নিয়ে চলেছে সর্বাপেক্ষা স্বল্প ও ঋজু পথে তার দিব্য লক্ষ্যের অভিমুখে, যদিও সে অজ্ঞান, যদিও সে কত ভুল বোঝে, যদিও তার অহং নিত্য প্রতিবাদ করছে ও বিদ্রোহ প্রকাশ করছে।

কৃতজ্ঞতার পবিত্র শিখা যেন নিত্যই উজ্জ্বল ও উষ্ণ ও মধুর হয়ে জ্বলতে থাকে আমাদের হৃদয়ে, তা যেন আমাদের সমস্ত অহংকে ও অন্ধতাকে বিলীন করে দেয়; ভগবানের যে অনন্ত কৃপা সাধককে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তার লক্ষ্যের দিকে, তার প্রতি এই কৃতজ্ঞতার শিখা যেন কখনও ম্লান না হয়—আর তুমি যতই বেশী কৃতজ্ঞ হয়ে এই কৃপার কাজটি উপলব্ধি করবে ততই তোমার পথও কমে আসবে।

[১২]

যে যেমন চায় পরমেশ্বর তাকে তেমনি দিয়ে থাকেন। যে অর্থ ভালবাসে তাকে তিনি অর্থই দেন, যে ভগবানকে ভালবাসে তাকে তিনি দেন দিব্য চেতনা আর শেষ পর্যন্ত দিয়ে দেন নিজেকেও।

[১৩]

অতীতকে অতীত করে দাও—শুধু অতীতই নয় কিন্তু একেবারে বিস্মৃতি, তাহলে শীঘ্রই এমন দিন আসবে যখন আর তা ফিরে এসে জীবনকে দুর্বহ করতে পারবে না।

সর্বদাই নিজেকে খুলে রাখ ভগবৎ প্রেমের দিকে।

[১৪]

মায়ের কৃপার কাছে যোগ্য বা অযোগ্য বলে কোন কথাই নেই। তিনি যখন যা বলেন বা করেন তার মধ্যে তাঁর চির-অপরিবর্তনীয় স্নেহস্পর্শ ও করুণাধারা সর্বদা সমান ভাবেই রয়েছে।

[১৫]

আপন হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান কর আপন সন্তোষ নিয়ে—একেবারে অন্তরের ভিতরে—এই হ'ল শান্তিলাভের একমাত্র উপায়।

[১৬]

ভগবানকে যদি ডাক বা তাঁর জন্য আস্পৃহাই করতে থাক, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি তোমার মনে বিন্দুমাত্র আশঙ্কা বা সন্দেহ থাকে যে তিনি হয়তো শুনতে পাবেন না বা তার জবাব দেবেন না, তাহলে অপর দিকের যত ছিদ্রান্বেষী ও সর্বদা হুঁশিয়ার বিরোধী শত্রুপক্ষের দল তোমার সেই আশঙ্কার বা সন্দেহটুকুর ফাঁকের ভিতর দিয়ে তোমার চেতনার মধ্যে ঢুকে সেখানে জোর দখল ক'রে আরো অনর্থ ঘটাবে। সুতরাং, তাঁকে ডাকতে চাইলে সে ডাক যেন খুবই খাঁটি ও আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়।

[১৭]

যখন দেখবে কোন কিছুতেই আর তোমাকে বিচলিত করতে পারছে না, আর সর্বদাই তুমি একটা আনন্দবোধের মধ্যে রয়েছ, তখনই জানতে পারবে যে তুমি উচ্চচেতনা লাভ করেছ।

[১৮]

ভাল ভাবে কি করে ঘুমাবে জানতে চেয়েছ—এ সম্বন্ধে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে যখন তুমি খুব পরিশ্রান্ত থাকবে তখন ঘুমাতে যাবে না, যদি তুমি তা কর তাহলে তুমি এক প্রকারের অচেতনা ও স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যাবে—এবং তারা তোমাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করবে—তখন তোমার আর নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে না। যেমন খাওয়ার পূর্বে কিছু সময় বিশ্রাম নেবে—তেমনি আমি উপদেশ

দেব যে ঘুমানর পূর্বেও কিছু সময় বিশ্রাম নেবে।

এ নেবার অনেক রকম পথ আছে। সর্বপ্রথমে তোমার দেহকে আরামদায়কভাবে বিছানায় বা আরাম কেদারায় ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়। তারপরে তোমার স্নায়ু সমূহকে আলগা বা শিথিল করে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা কর—সব একসঙ্গে অথবা একটার পর একটা করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ণ শিথিলতা আসে। এটা হ'য়ে গেলে, এবং যখন তোমার দেহ বিছানার ওপর যেন একটা কম্বলের মত পড়ে থাকবে, তখন তোমার মগজকে (Brain) নীরব ও গতিশূন্য করে রাখ—যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আর নিজের সম্বন্ধে সচেতন থাকে। তারপরে আস্তে আস্তে অজান্তে ঘুমের এই অবস্থা হ'তে ঘুমের ভিতরে চলে যাও। যখন তুমি পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠবে তখন পূর্ণ কর্মশক্তি নিয়ে জেগে উঠ্‌বে। তা না ক'রে যদি তুমি পূর্ণভাবে পরিশ্রান্ত থেকে এবং নিজেকে বিশ্রাম না দিয়ে, শিথিল না করে শুয়ে পড়, তাহলে এক ভারী, অজ্ঞানতাময় অচেতনার ঘুমের রাজ্যে চলে যাবে- যাতে করে তোমার প্রাণ সত্তা সকল প্রকার কর্মশক্তি হ'তে বঞ্চিত হবে।

এর অভ্যাসে হয়ত তুমি সদ্য ফল পাবে না কিন্তু লেগে থাকলে ফল পাবেই।

[১৯]

যাদের কোনদিন ধ্যান সমাধি হয় নি তাদের পক্ষেও নিদ্রার পূর্বে কোন মন্ত্র, কোন প্রার্থনা বারবার উচ্চারণ করা ভাল। কিন্তু ঐ সকল মন্ত্রে বা প্রার্থনায় প্রাণ থাকা আবশ্যক। ঐ সকল মন্ত্র বা কথা স্পন্দিত হবে—স্পন্দিত হয়েই চলবে···এবং আস্তে আস্তে তুমি নিজেকে ছেড়ে দেবে—যেন তুমি নিজে ঘুমের ভিতরে তলিয়ে যেতে চাইছ। দেহ অধিকতর—আরও অধিকতর ভাবে স্পন্দিত হ'তে থাকবে আর তুমি তলিয়ে যাবে তারই ভিতরে। তমসা থেকে মুক্ত হওয়ার এই-ই উপায়।

১০.

দিব্য-স্রষ্টা মা

"কর্মের প্রভু, তাঁর যে কোন বিভাবে সাধকের অন্তরে এসে তার কর্মের ভার গ্রহণ করতে পারেন। কালক্রমে তাঁর সমস্ত বিভাবই আত্মপ্রকাশ করে, অবশেষে তাদের সকলের মধ্য দিয়ে ভাস্বর দীপ্তিতে প্রকাশিত হ'ন সেই পরম সত্যবস্তু যিনি মনের নিকট অজ্ঞেয় কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনা ও অতিমানস জ্ঞানের আলোকে স্বয়ং প্রজ্ঞ বলিয়া যিনি জ্ঞেয়।"

—যোগসমন্বয়

আশ্রম সংগঠন

শ্রীমা আসার পর হতেই অধ্যাত্ম পিপাসু ভক্তজনের সমাগম হতে থাকে পণ্ডিচেরীতে। ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ-হ'তে ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র হ'তে সমাগম হ'তে থাকে মুমুক্ষু মানব—তাদের মধ্যে কেউ বা জ্ঞানী, বিদ্বান, কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, বাস্তুকার, রাজনীতিক, যান্ত্রিক, আইন বিশারদ, চাকুরে, ব্যবসায়ী, সাধক ও এমন কি সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী পর্যন্ত।

শ্রীমায়ের সংগঠনা শক্তিতে গড়ে ওঠে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম—একখানি বাড়ী হতে ধীরে ধীরে পণ্ডিচেরী সহরের অর্ধেক বাড়ীই সাধকদের বাসস্থানে পরিণত হয়—প্রত্যেকটি বাড়ীরই বর্ণ ধূসর—প্রত্যেকটিই সুচীশুভ্র পরিচ্ছন্ন পরিবেশে অধ্যাত্ম আলোকে ভরপুর। ক্রমে গড়ে ওঠে আগন্তুক ভবন গোলকুণ্ডে, মায়ের নিজস্ব পরিকল্পনায়—অনবদ্য তার স্থাপত্য শৈলী, আশ্রমের অধ্যাত্ম চেতনার অনুভূতি পাওয়া যায় সেখানে। গড়ে ওঠে স্বাভাবিক ভাবেই রন্ধনশালা ও খাবার ঘর—দু'হাজার মানুষের খাবার ব্যবস্থা আছে সেখানে—সাদাসিদে নিরামিষ খাওয়া কিন্তু সুষম খাদ্য। ক্রমে গড়ে ওঠে আরও নতুন নতুন আগন্তুক ও বাস ভবন সমূহ—সে সকল নির্মিত হয় পৃথিবীর নানা দেশের মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী করে।

খাদ্যে আশ্রম স্বয়ং সম্পূর্ণ—পর নির্ভরতা নেই এতটুকুও। চাল,

গম, তরি-তরকারি প্রভৃতি সবই উৎপন্ন হয় আশ্রমেরই ক্ষেতে মাঠে সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায়। দুধ ও ডিমের জন্য আছে ডেয়ারি ও পোল্ট্রী—চিজ, মাখন প্রভৃতিও প্রস্তুত হয় ডেয়ারিতে। সুষম খাদ্যের জন্য আছে কলা, আঙুর, পেয়ারা, কাজু বাদাম প্রভৃতির গাছ—আশ্রমের প্রয়োজনীয় সব কিছুই আশ্রম-বাসীরা নিজেরাই উৎপন্ন করেন। ঘর দোর তৈরী মেরামতের জন্য আছে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ—সেখানে মোজাইক টালি, কব্জা, ইস্ক্রুপ হতে আরম্ভ করে বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়—পাশাপাশি চলেছে বেকারী, লণ্ড্রী, হাতে প্রস্তুত কাগজের কারখানা, বয়নশিল্প, কুটির শিল্প, এমনকি ভারী শিল্পেরও কারখানা সমূহও। এ ভিন্ন আছে পৃথিবীর অনেকগুলি ভাষায় মুদ্রণের জন্য সর্বাধুনিক ছাপাখানা—অফসেট, ব্লক মেকিং সব সরঞ্জাম নিয়ে। সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছে এক বিরাট প্রকাশনা বিভাগ। শ্রীঅরবিন্দের, শ্রীমায়ের ও বিশিষ্ট ভক্ত শিষ্যগণের রচনার মুদ্রণ হয় এই ছাপাখানায় এবং তার প্রকাশন ও পরিবেশন করেন শ্রীঅরবিন্দ বুক ডিষ্ট্রিবিউসন এজেন্সি বা সাবদা (SABDA) ভারতের ও পৃথিবীর সর্বত্র। সকল কাজের কর্মী আশ্রমের ভক্তজনই—কাজ এখানে সাধনারই অঙ্গ—সব কাজই মায়ের কাজ—সব কাজই মাকে সমর্পণ করে নিষ্কামভাবে করেন সকলে নিখুঁতভাবে পরিপূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে। মা-ই সব কাজের মধ্যমণি—এতবড় যে কর্মযজ্ঞ তা নিষ্পন্ন হয় নীরবে সম্পূর্ণ ঐ একজনেরই ইঙ্গিতে ও নির্দেশে এবং সকলেই ভগবদ কর্ম বলে তা সম্পন্ন করেন পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে—তা ক্ষেতে, মাঠে, কারখানায়, ছাপাখানায়, লণ্ড্রীতে, মোটর গ্যারেজে, ইন্‌জিনিয়ারিং কাজে, বস্ত্র বয়নে, জল সরবরাহে, অতিথি নিবাসে, রন্ধন শালায়, খাবার ঘরে, বাসন ধোয়ায়, অভ্যাগতের আপ্যায়নে বা আর যেখানেই হোক না কেন।

খাবার ঘরে প্রত্যহ মিলিত হন প্রায় দু-হাজার নরনারী—প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্ন ও রাত্রের খাওয়া সমাধা করেন সবাই সেখানে।

খাওয়ার শেষে প্রত্যেকটি বাসনই বৈজ্ঞানিক ধারায় সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করা হয়—পূর্ণ পরিচ্ছন্নতায় সকলকেই একই প্রকার খাদ্য পরিবেশন করা হয়।

শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেন্দ্র

আশ্রম বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমবাসীদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার অভাব অনুভূত হয়। প্রথমে মা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জুটিয়ে নিয়ে নিজেই ক্লাস নিতে আরম্ভ করেছিলেন—সেই থেকেই সূচনা শিক্ষায়তন স্থাপনের। মায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ এক নূতন ধাঁচে গড়ে উঠতে আরম্ভ করল—কিন্তু সে গতানুগতিক শিক্ষাধারা নয়। যে শিক্ষায় পরিপূর্ণতা নিয়ে আসে না, যে শিক্ষা প্রাণবন্ত নয়, যে শিক্ষায় জীবন দর্শনের সন্ধান মেলে না—মায়ের শিক্ষা পরিকল্পনায় তার স্থান নেই। মায়ের শিক্ষার আদর্শ হ'ল সত্যকারের জীবনাদর্শ ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরা ও সেইভাবে শিক্ষা ধারা গড়ে তোলা —এতে চার প্রকারের শিক্ষা-ব্যবস্থা স্থান পেয়েছে, যথা—

১। শারীর (Physical) শিক্ষা ;

২। মানসিক (Mental) শিক্ষা ;

৩। প্রাণিক (Vital) শিক্ষা, এবং

৪। আধ্যাত্মিক (Spiritual) শিক্ষা।

প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বললেন—"প্রকৃত প্রাণবন্ত শিক্ষায় তিনটি বিষয় মনে রাখতে হবে—

১। ব্যক্তি—তার সাধারণত্ব ও অসাধারণত্ব নিয়ে,

২। জাতি, এবং

৩। পৃথিবীর জন সমাজ।

সেই হবে প্রকৃত প্রাণবন্ত শিক্ষাধারা যা পূর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে—যা ব্যষ্টি মানবকে তার প্রাণ ও আত্মার সহিত জাতির ও পৃথিবীর বিশাল মানব গোষ্ঠির মিলিত মন, প্রাণ ও আত্মার একাত্মতা অনুভব করায়।"

শিক্ষার নব আদর্শ রূপায়ণের নীতি সম্বন্ধে শ্রীমা বললেন—

"শিক্ষার নীতি হবে সত্য, সমন্বয় ও স্বাধীনতা।...পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা হবে আমাদের উদ্দেশ্য। ভারত অধ্যাত্ম জ্ঞানে বলীয়ান ছিল, কিন্তু সে বাস্তব জ্ঞানকে অবহেলা করেছে, তারই জন্য সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পশ্চিম বাস্তব জ্ঞানে পারদর্শী কিন্তু অধ্যাত্ম বিজ্ঞানকে সে অবহেলা করেছে—সেজন্য সে-ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই কারণেই পূর্ণতর শিক্ষা ব্যবস্থাই পৃথিবীর মানুষকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।"

মা আরও বললেন—"ছেলেমেয়েদের শেখাও তাদের নিজেদেরকে জানতে, তাদের নিজেদের পরিণাম তাদের নিজেদেরকেই গড়ে তুলতে দাও। তাদের নিজেদের দিকে চাইতে শেখাও, নিজেদেরকে বুঝতে শেখাও, নিজেদের ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ করতে শেখাও। এসব শেখান —পৃথিবী কি করে গড়ে উঠছে বা কোন এক সময়ে কি এক ঘটনা ঘটেছে তা জানার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হ'ল চিত্রকলা, সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয়, শারীর শিক্ষা ব্যবস্থা। নির্মিত হ'ল জিমনাসিয়াম, সুইমিংপুল, অভিনয় মঞ্চ প্রভৃতি।

ভাল ভাল শিক্ষাব্রতীরা এসে উপস্থিত হলেন নানা দেশ হতে— তেমনি ছাত্র ছাত্রীরাও এসে পৌঁছিল নানা দেশ হতে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুস্তকরাজী নিয়ে গড়ে উঠল গ্রন্থাগার। ছেলে মেয়েরা সেখানে স্বেচ্ছায় জ্ঞান আহরণ করতে থাকল কলা, বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন, খেলাধূলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অভিনিবেশ সহকারে— গ্রন্থাগার তাই হয়ে উঠেছে এক জীবন্ত কর্মশালা।

শারীর-শিক্ষার ক্ষেত্রেও এক অভিনব শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুললেন মা—যা ভারতে অদ্বিতীয় বলা যায় এবং যার জন্য ভারত সত্যই গর্ব অনুভব করতে পারে। এ শারীর শিক্ষণ ব্যবস্থা সর্বাধুনিক ও নিখুঁত —পৃথিবীর যে কোন দেশের অনুরূপ ব্যবস্থার সঙ্গে সম বা অধিক পারদর্শিতার দাবী রাখে।

যে কোন দর্শক বা আগন্তুক যদি আশ্রমের খেলার মাঠে, সন্তরণের জলাশয়ের ধারে, জিমনাশিয়ামের নিকটে আসেন তাহলে দেখবেন কেবল ছেলে-মেয়েরাই নয়, প্রবীণ এবং বৃদ্ধেরাও সমানভাবে খেলছেন, ছুটছেন, ও ব্যায়াম করছেন।

সন্ধ্যায় ব্যায়ামের পরে সারিবদ্ধ হয়ে বসে পড়েন সবাই উন্মুক্ত প্রান্তরে—আলো নিভে যায়, উদ্গত হয় প্রার্থনা সবারই অন্তর হতে —উত্থিত হয় সুর ঝঙ্কার পরমের প্রতি আকুল নিবেদন জানিয়ে—উচ্চারিত হয় বেদমন্ত্র—ভক্তির বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় সকলকে—মৌন ধ্যানে সমাহিত হ'ন সবাই—আবহাওয়া সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে অধ্যাত্ম চেতনায়—মায়ের চেতনায়।

এই নূতন অনবদ্য শিক্ষা ধারা গড়ে উঠেছে মায়েরই প্রেরণায় জগতের ছেলেমেয়েদের জন্যে—যেখানে যে যার নিজের প্রবণতা নিয়ে স্বাধীনভাবে অনুসরণ করতে পারবে তার শিক্ষাক্রম—উত্তরাধিকারী হবে সর্বকালের সর্বদেশের মহান ঐতিহ্যের। এই অভিনব আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর গুণীজনের নিকট হতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে—"শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র নামে।"

এই সবেরই পিছনে আছে মায়ের নিপুণ হাতের স্পর্শ। কেউই জানে না কি ভাবে কোথা হতে সব সম্পন্ন হচ্ছে—আর কেউ তা জানতেও চায় না। তারা এই পর্যন্ত জানে যে তাদের সকলের মা —ভগবতী বিশ্বজননী—সব কিছুই জানেন। তিনিই সকলের ভাগ্য বিধাতা—তাঁর চোখ সর্বত্রই আছে। মা যে কাজই দিয়েছেন বা যা কিছু করতে নির্দেশ দিয়েছেন তাতেই তারা খুসী—তা কাজই হোক, সাধনাই হোক, বা অন্য যা কিছুই হোক। তারা ভালভাবেই জানেন যে মা প্রত্যেকের থেকে বেশী জানেন, ভাল জানেন—কি তাদের পক্ষে মঙ্গল আর কিই বা অমঙ্গল। প্রতিটি কাজ, প্রতিটি বিষয় কার্যকরী-রূপে, সুন্দর সুচারুরূপে সম্পাদিত হচ্ছে এবং প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের কাজে অনুপ্রেরণা আহরণ করছেন মায়েরই নিকট হতে।

যদিও কেউই সন্ন্যাসীর গেরুয়া ধারণ করেননি—কিন্তু প্রত্যেকেরই অন্তর রঙিয়ে নিয়েছেন গৈরিক রংয়ে—নিষ্কাম কর্ম ও সাধনা তাই চলেছে নিরন্তর সমান্তরাল ভাবে—অভিনব পদ্ধতিতে—যেমনটি ঠিক মা বলেছেন।

আশ্রম সম্বন্ধে শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ ১৯৪০ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে খুলনাবাসী পত্রিকায় বেশ এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি লিখেছেন—

"পণ্ডিচেরীর যোগাশ্রমে মা-ই হলেন শ্রীঅরবিন্দের যোগের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তাঁরই সৃজন প্রতিভার স্পর্শে এই আশ্রম এমন বর্তমান আকার নিয়েছে। এর প্রত্যেক বিভাগেই তাঁর মৌলিক গঠন প্রতিভার ছাপ রয়েছে। এত বড় একটা বিরাট সংসার, তার প্রতি অংশে দিনের পর দিন ঘড়ির কাঁটার মত নীরবে ও নিঃশব্দে অতি সুশৃঙ্খল সকলে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, কোথাও কোন বিরোধের নাম গন্ধ নেই, এমন আর দ্বিতীয় কোথাও জগতের মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্যের গঠনমূলক শক্তির সঙ্গে মিশেছে প্রাচ্যের আত্মনিবেদন, তাই-ই দেখা যায় এই আশ্রমের প্রাণধারার মধ্যে। কিন্তু এই আশ্রমটিকে এমন পরিপূর্ণ রকমে গড়ে তোলাই মায়ের সব চেয়ে বড় সার্থকতা নয়। যোগশক্তির বাহ্য অভিব্যক্তির প্রতিমারূপে তিনি এই আশ্রমকে কেন্দ্র করে সর্বত্রই তাঁর ক্রিয়া প্রসারিত করেছেন।····এই দু'জনের যোগশক্তির প্রভাবে নগণ্য আশ্রম সামান্য থেকে অসামান্য হয়ে উঠল, এর অভাব অপূর্ণতা ঘুচে গিয়ে প্রাচুর্যে ভরে উঠল। চারদিক হতে শিষ্য ও ভক্তেরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে প্রচুর অর্থ নিবেদন করতে থাকল। তাছাড়া সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে কাব্য-শক্তি স্ফুরিত হতে দেখা গেল, কেউ বা অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রাঙ্কন করতে লাগল, কেউ বা ধ্যানে, অলৌকিক দৃষ্টিতে বা সূক্ষ্মকার্যে পারদর্শী হয়ে উঠল। দিনে দিনে এই আশ্রম সারা জগতের পক্ষে যোগের এক তীর্থস্থান হয়ে দাঁড়াল।"

আন্তর্জাতিক দার্শনিক সংঘের প্রেসিডেণ্ট খ্যাতনামা এম, এফ,, রুফ, লিখেছেন—"আমার আশ্রম দর্শনের স্মৃতির মধ্যে যে তিনটি অনুভূতি পেয়েছি তা সব সময় উজ্জল হ'য়ে আছে, তা হচ্ছে: সৌন্দর্য, উৎসাহ আর বুদ্ধি দীপ্তি। যে স্নিগ্ধ প্রশান্ত সৌন্দর্য এর চারিদিকে ঘিরে নিত্য অভিব্যক্ত হচ্ছে তা অবিস্মরণীয়।"

"শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম জীবন কথায়" সর্বদেশের সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিতে আশ্রমের অবদান সম্বন্ধে লেখা হয়েছে—"কাজের ভিতর দিয়ে এই আশ্রমের ঐক্যভাব—জাতি, ধর্ম, বয়স ও সংস্কার নির্বিশেষে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সকল ধর্মের, সকল দেশের, সকল সংস্কৃতির মানুষ এখানে আপন আপন প্রবণতা নিয়ে চলতে পারে, অথচ সকলে মিলে সামগ্রিকভাবে এক অখণ্ড পরিবার—আর এ সকলেরই রূপকার ও প্রেরণাদাত্রী হচ্ছেন আশ্রম জননী শ্রীমা।"

শ্রীমাধব পণ্ডিত বলেছেন—"আশ্রমের সকল জীবন মাকেই ঘিরে—তাঁর ব্যক্তিত্বকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। আশ্রমের প্রত্যেক পত্রটি, প্রত্যেক ইটখানি পর্যন্ত মা! মা! ব'লে স্পন্দিত হ'চ্ছে। সমগ্র আশ্রম মায়ের উপস্থিতিতে কানায় কানায় ভরপুর। সকলের নিকট আশ্রম ভগবদ নিবাস—মায়ের নিকট তা হ'চ্ছে তাঁর প্রসারিত দেহ—সেখানে তিনি সকলকে গ্রহণ করেন যারা সত্যের আলোকের অনুসন্ধিৎসু-নিজের জীবনপাত ক'রে সত্য চেতনায় তাদের গড়ে তোলেন—যা মানুষের পার্থিব অমরত্বের নূতন জীবন গঠনের কাজে সহায়ক হবে।"

১১

প্রশ্ন-উত্তরে মায়ের অমৃত কথা

"অনন্তকাল ধরেই তো তোমাকে আমি নির্বাচিত করে রেখেছি, পৃথিবীর বুকের ওপর তুমি আমার অপ্রতিম প্রতিভূ হ'য়ে থাকবে, অদৃশ্য ভাবে গোপন ভাবে নয়, প্রত্যক্ষ ভাবে, সকল মানুষের চক্ষুর সম্মুখে। যা হবার জন্তে সৃষ্ট হয়েছিলে, তাই তুমি হবে।"

— ধ্যান ও প্রার্থনা

শ্রীমা মধ্যে মধ্যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এসে তাদের গল্প শোনাতেন, উপদেশ দিতেন, তাদের সকল রকম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করতেন এবং ঐ ভাবে তাদের জ্ঞান সঞ্চয়নে ও সাধনায় সহায়ক হতেন। ঐ সকল প্রশ্নোত্তর সকলেরই সাধন পথে দিশারী হতে পারে—সেইজন্য তার ভিতর হতে কিছু কিছু সংগ্রহ করে এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল:

প্রশ্ন—কোথায় প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ?

শ্রীমা—প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবন আরম্ভ হয় তখনই যখন চৈত্য সত্তায় ভগবানের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হয়। যখন কেউ চৈত্য সত্তায় ভগবদ উপস্থিতি সম্বন্ধে চেতন সম্পন্ন হয়—এবং যদি চৈত্য সত্তায় সেই যোগ স্থায়ী নাও হয়, যদি তার জন্য আস্পৃহা ও চেষ্টা থাকে—তখনই, তার পূর্বে নয়, অধ্যাত্ম জীবন আরম্ভ হয়—প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবন বলতে যা বোঝায়।

যখন কেউ নিজের চৈত্য সত্তার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সেখানে ভগবদ উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকে, যখন কেউ এই ভগবদ উপস্থিতি হতে কাজের প্রেরণা পায়, যখন কারোর ইচ্ছা ভগবদ ইচ্ছার সচেতন সহযোগী হয়ে ওঠে—তখনই বুঝতে হবে যে যাত্রা সুরু হয়েছে। এর পূর্বে অধ্যাত্ম জীবনের অভিলাষী হওয়া যেতে পারে কিন্তু প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবন আরম্ভ হবে না।

প্রশ্ন—আমাদের যোগের কথা কিছু বলুন।

শ্রীমা—কি উদ্দেশ্যে তুমি যোগ চাও? শক্তি সঞ্চয়ের জন্য? অবিকম্প শান্তি লাভের জন্য? শুধু এর কোনটা থেকে বোঝা যাবে না যে তুমি যোগের অধিকারী। যে প্রশ্নের জবাব তোমাকে দিতে হবে তা এই—তুমি কি ভগবানের জন্য যোগ চাও? ভগবান কি তোমার জীবনের পরম বস্তু—এতদূর যে তিনিই তোমার সত্তার যথার্থ কারণ, তাঁকে বাদ দিলে তোমার বাঁচারই কোন অর্থ থাকে না? যদি এই হয় তবেই বলব যে তুমি যোগের পথে প্রবেশের ডাক পেয়েছ।

তাহলে প্রথমেই যা চাই, তা হচ্ছে ভগবানের প্রতি আস্পৃহা আকুতি। তারপর তোমার কাজ হবে এই আকুতিকে পোষণ করা, তাকে সদা জাগ্রত ও জীবন্ত রাখা। এ জন্য দরকার একাগ্র অভিনিবেশের—তাঁর সঙ্কল্প তাঁর ইচ্ছার কাছে সমগ্র ও পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গের উদ্দেশ্যে।

হৃদয়ে অভিনিবিষ্ট হও—হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ কর—যতদূরে যতটা গভীরে যেতে পার। তোমার চারিদিকে ছড়ান চেতনার বিক্ষিপ্ত সব সূত্রগুলি একত্র করে নাও, নিয়ে ঝাঁপ দাও, তলিয়ে যাও।

সেখানে দেখবে হৃদয়ের গভীর নীরবতার মাঝে একটি অগ্নিশিখা জ্বলছে। সেই শিখা তোমার অন্তরের দেবতা—তোমার যথার্থ সত্তা। তার বাণী শোন, তার আদেশ পালন কর।

তোমার দেহের ভিতরে অভিনিবেশের আরও সব কেন্দ্র আছে; যথা, একটি শীর্ষস্থানে, একটি ভ্রূযুগলের মাঝে। প্রত্যেকটিরই নিজের নিজের উপযোগীতা আছে, প্রত্যেকটি থেকেই বিশিষ্ট ফল পাবে। কিন্তু হৃদয়েতেই তোমার সত্তার কেন্দ্র, এই কেন্দ্র হতে বের হয় সকল মূল বৃত্তি, সকল গতি, সকল প্রেরণা—উপলব্ধির ও রূপান্তর সাধনের।

প্রশ্ন—যোগের জন্য প্রস্তুত হতে হলে কি করতে হবে?

শ্রীমা—সর্বপ্রথমে ও সর্বাগ্রে সচেতন হতে হবে। আমরা আমাদের সামান্য অংশ সম্বন্ধেই সচেতন; বাকী অংশ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চেতন। এই নিশ্চেতনাই আমাদের বেঁধে রেখেছে আমাদের নীচের সত্তার সঙ্গে, এই-ই বাধা দেয় সকল রূপান্তর, সকল সত্তান্তর সাধনে। আসুরী শক্তি সমূহ এরই আশ্রয় নিয়ে আমাদের মধ্যে ঢুকে আমাদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধে।

তোমাকে সচেতন হতে হবে তোমার নিজের সম্বন্ধে, তোমার স্বভাব সম্বন্ধে, গতিবৃত্ত সম্বন্ধে। তোমাকে জানতে হবে কেন ও কেমন করে তুমি কাজ কর, কেন ও কেমন তোমার অনুভূতি, তোমার চিন্তা। তোমাকে বুঝতে হবে তোমার লক্ষ্য ও প্রেরণা সমূহকে। আর যে সব গুঢ় ও প্রকট শক্তি সমূহ তোমাকে চালায় তাদেরকে। তোমার সত্তারূপ যন্ত্রকে টুকরো টুকরো করে দেখে পরীক্ষা করতে হবে। একবার সচেতন হলে তুমি সকল বস্তুকে বিচার করে গ্রহণ করতে পারবে, দেখতে পাবে কোন শক্তি তোমাকে টেনে নীচে নামায়—কোন শক্তি তোমাকে ঠেলে এগিয়ে দেয় তোমার গন্তব্য পথে। তারপর যখন তুমি ধর্ম অধর্ম, সত্য অসত্য, দিব্য অদিব্যের প্রভেদ বুঝবে তখন সেই বোধ অনুযায়ী কর্ম করে যাবে; তার অর্থ এই যে শক্ত হয়ে যা প্রতিকূল তাকে প্রত্যাখ্যান করবে, যা অনুকূল তাকে গ্রহণ করবে। প্রতিপদে এইসব পরস্পর বিরোধী প্রেরণা তোমার সামনে আসবে, আর প্রতিপদে তোমাকে বেছে নিতে হবে যেটি গ্রহণীয় তাকে। তোমাকে হ'তে হবে ধীর একনিষ্ঠ অবহিত—সাধকের ভাষায় সদাজাগ্রত বিনিদ্র। দিব্যশক্তির বিরুদ্ধে অদিব্যশক্তিকে কখনও এতটুকু প্রশ্রয় দেবে না।

প্রশ্ন—ধ্যানের চেষ্টা বাড়াবার কি কোন দরকার নেই? একথা কি সত্য নয় যে, যত বেশীক্ষণ ধ্যান করা যায়, ততই সাধনার পথে এগিয়ে যাওয়া যায়?

শ্রীমা—কত ঘণ্টা ধ্যানে বসছ তার থেকে স্থির হয় না তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি কতখানি হয়েছে। উন্নতি হয়েছে তখনই বুঝব যখন তোমার ধ্যানস্থ হতে কোন চেষ্টা করতে হয় না; তখন বরঞ্চ ধ্যান ছেড়ে উঠতে বেশ চেষ্টা করতে হয়; ধ্যান বন্ধ করা কঠিন হয়ে ওঠে; ভগবদ চিন্তা থামাতে কষ্টবোধ হয়; সাধারণ চেতনাতে নেমে আসা শক্ত মনে হয়। তখনই তোমার পথ খুলেছে, তখনই তোমার যথার্থ উন্নতি হয়েছে যখন পরম অভিনিবেশ তোমার জীবনে এমন একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছে যে তা নইলে থাকতে পার না, যখন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সারাক্ষণ সকল কাজের মাঝে তোমার একাগ্রতা অটল রয়েছে। ধ্যানেই বস বা ঘুরে বেড়াও বা কাজ কর্ম কর—যেটি দরকার সেটি হচ্ছে চেতনা—একমাত্র প্রয়োজন ভগবৎ সম্বন্ধে নিয়ত সচেতন থাকা।

প্রশ্ন—সক্রিয় ধ্যান (Dynamic Meditation) বলতে শ্রীঅরবিন্দ কি বোঝাতে চেয়েছেন (তাঁর যোগসমন্বয় পুস্তকে) ?

শ্রীমা—এ এমন এক ধ্যান যাতে তোমার সত্তার রূপান্তর সাধনের শক্তি আছে। এ এমন এক ধ্যান যাতে তোমাকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নিষ্ক্রিয় ধ্যান (Static Meditation) নিশ্চল, অপেক্ষাকৃত স্থাণু, যা চেতনার কোন পরিবর্তন ঘটায় না কিম্বা সত্তার কোনরূপ উন্নয়ন সাধন করে না—সক্রিয় ধ্যান ঠিক এই সকলের বিপরীত। সক্রিয় ধ্যান হচ্ছে রূপান্তরের ধ্যান। সাধারণতঃ মানুষ সক্রিয় ধ্যান করে না। যখন তারা ধ্যানে প্রবেশ করে—অন্ততঃ যাকে তারা ধ্যান বলে অভিহিত করে—তখন তারা একপ্রকার নিশ্চল অবস্থায় প্রবেশ করে—যাতে তারা একটুও অগ্রসর হতে পারে না। যে অবস্থায় তারা ধ্যানে প্রবেশ করেছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই তারা বেরিয়ে আসে—চেতনার বা সত্তার কোনরূপ পরিবর্তন না এনেই—এবং যতই তারা নিষ্ক্রিয় হতে থাকে ততই তারা আনন্দ অনুভব করতে থাকে। এইভাবে

অনাদি কাল পর্যন্ত তারা ধ্যান করতে পারে কিন্তু তাতে কিছুই বদল হবে না—নিজেদেরও কোন পরিবর্তন ঘটবে না। এই জন্যই শ্রীঅরবিন্দ সক্রিয় ধ্যানের কথা বলেছেন—যা গতানুগতিক ধ্যানের ঠিক বিপরীত। সক্রিয় ধ্যান হচ্ছে রূপান্তরের ধ্যান।

প্রশ্ন—সক্রিয় ধ্যান পেতে হলে কি করতে হবে? তার পথ কি ভিন্ন নয়?

শ্রীমা—পথ বলতে তুমি কি বোঝ—ধ্যানে কি ভাবে বসবে? আমি মনে করি তার জন্যে তোমার আস্পৃহা ভিন্ন প্রকারের হতে হবে; মনোভাব ভিন্ন প্রকারের হতে হবে এবং তা হবে অন্তরের বা ভিতরের বস্তু। কিন্তু প্রত্যেকের বেলাতে তা বিভিন্ন প্রকারের হবে। আমি মনে করি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে তোমাকে বুঝতে হবে কেন তুমি ধ্যান করছ। এতে ধ্যানের উৎকর্ষতা বাড়বে ও তা থেকেই বোঝা যাবে যে এ কি প্রকারের ধ্যান।

তুমি ভগবদ শক্তির নিকট নিজেকে খুলে ধরার জন্যে ধ্যান করতে পার, তুমি সাধারণ চেতনা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ধ্যান করতে পার, তুমি তোমার অন্তরের গভীরে প্রবেশের জন্যে ধ্যান করতে পার, তুমি কি ভাবে নিজেকে সমর্পণ করবে তা জানার জন্যে ধ্যান করতে পার—এইভাবে নানা বিষয়ের জন্যে তুমি ধ্যান করতে পার। তুমি শান্তি, স্থিরতা ও নীরবতায় প্রবেশের জন্যেও ধ্যান করতে পার—আর তাই মানুষ সাধারণতঃ করে, যদিও তাতে তারা বিশেষ সাফল্য অর্জন করে না। কিন্তু তুমি রূপান্তরের শক্তিকে গ্রহণের নিমিত্ত ধ্যান করতে পার, কোন্ কোন্ বিষয়ে রূপান্তর প্রয়োজন তা জানার জন্যে ধ্যান করতে পার, তোমার প্রগতির পথের অনুসন্ধানের জন্যেও ধ্যান করতে পার। এ বাদে অতি-বাস্তব বিষয়ের জন্যেও ধ্যান করতে পার, উদাহরণ স্বরূপ, যখন তোমাকে কোন প্রতিবন্ধক পার হতে হবে, কোন বিষয়ের সমাধান

বার করতে হবে, কোন বিশেষ কাজে যখন তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

আমি মনে করি প্রত্যেকের নিজস্ব ধ্যান পথ আছে। কিন্তু যদি তুমি তোমার ধ্যানকে সক্রিয় ধ্যানে পরিণত করতে চাও তাহলে তোমার প্রগতির জন্যে চাই আস্পৃহা—এবং ধ্যান করতে হবে সেই আস্পৃহাকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে ও তার উপলব্ধির জন্যে ; তবেই তোমার ধ্যান হয়ে উঠবে সক্রিয়।

প্রশ্ন—আমি ধ্যানে বসি এবং ঐকান্তিক ভাবে আকুল হয়েই প্রার্থনা করি, গভীর আস্পৃহা নিয়ে ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনায় নিমগ্ন হই, কিন্তু কিছু সময় পরেই—কখনও বেশী, কখনও বা কম সময় পরেই আস্পৃহা হয়ে ওঠে গতানুগতিক আর প্রার্থনা হয়ে দাঁড়ায় মৌখিক মাত্র—এবিষয়ে কি করা যেতে পারে ?

শ্রীমা—এ যে কেবল তোমার বেলাতেই হয় তাই নয়—এ সাধারণ-ভাবে সকলের বেলাতেই ঘটে। আমি বহুবার বলেছি যে যারা একসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ধ্যান করে ও সমস্ত দিনই প্রার্থনাতে কাটায়—আমি নিশ্চিত যে তারা তাদের চারভাগ সময়ের তিনভাগই এ কাজ যন্ত্রবৎ করে যায়—যাতে করে তাদের ঐকান্তিকতা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। কারণ মানুষের প্রকৃতি ঐ কাজের জন্য প্রস্তুত নয় আর তাদের মনও ঐ ভাবে তৈরী নয়।

প্রার্থনার বেলাতেও ঐ একই কথা, তোমার ভিতরে হঠাৎ অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে ; তোমাকে ভিতর থেকে ঠেলে এগিয়ে দেবে, প্রবেগে তা উদ্বেল হয়ে উঠবে, এবং যদি তা সত্য হয় তাহলে তা স্বতঃস্ফুর্তভাবে তোমার কথায় প্রকাশ পাবে। এ মাথার ভিতর দিয়ে না এসে হৃদয় কেন্দ্র হতে আবেগে সোজা বেরিয়ে আসবে ; এই হচ্ছে প্রার্থনা (কিন্তু যদি তা তোমার মুখ নিসৃত কথাই শুধু হয় তাহলে তা প্রার্থনাই নয়)। এখন, যদি তুমি ঐ অগ্নি শিখায় বা তোমার প্রার্থনায় ইন্ধন না দাও তাহলে

কিছুকাল পরেই তা নিভে যাবে।

যদি তোমার মাংসপেশীকে বিশ্রাম না দাও, যদি তাদের শিথিল না কর, তাহলে মাংসপেশীর সংকোচন শক্তি বিনষ্ট হবে। তাহলে এটাই স্বাভাবিক, এমন কি নিশ্চিত যে কিছুকাল পরে সে আর কাজ করতে পারবে না।

প্রত্যেকের পক্ষেই এমন একটা সময় আসে যখন ধ্যান প্রভৃতিতে বিরতি দিতে হয়—বিশ্রাম নিতে হয় আবার নূতন করে আরম্ভ করার জন্যে। কাজেই যদি কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টা পরে ধ্যানের ক্রিয়া যান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায়—তাহলে বুঝতে হবে তোমার শিথিলতা এসেছে—সেক্ষেত্রে তোমার আর ধ্যানের ভান রাখার প্রয়োজন নেই—তখন ধ্যান ছেড়ে অন্য কোন প্রয়োজনীয় কাজ করা ভাল।

ওটি আন্তরিকতার অভাবে নয়—অক্ষমতার দরুণই হয়। আন্তরিকতার অভাব তখনই হবে যখন তুমি ধ্যানের ভান করবে অথবা লোকে যেমন মন্দিরে বা গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করে সেই ভাবে মুখস্থ পড়ার মত প্রার্থনা করতে থাকবে। এ ধ্যানও নয়—প্রার্থনাও নয়—এ নিছক বাঁধা কাজ করে চলা—ওতে কোন ফল হবে না।

প্রশ্ন—ধ্যানে বসা কি একটা অবশ্য পালনীয় নিয়ম নয়? ধ্যান কি ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর অন্তরঙ্গ যোগ এনে দেয় না?

শ্রীমা—হতে পারে। কিন্তু আমরাতো শুধু আত্ম-নিয়মন চাইছি না। আমরা চাইছি পরমপুরুষে অভিনিবেশ—সর্বদা সকল কর্মে, সকল বৃত্তিতে, সকল ক্রিয়াতে। এখানে অনেকে আছেন যাঁদের ধ্যান করতে বলা হয়েছে—আবার তেমনি অনেকে আছেন যাঁদের কোন ধ্যান করতে বলা হয় নি; তা বলে ভেবো না যে তারা সাধনার পথে অগ্রসর হচ্ছে না, তারাও নিয়ম পালন করছে, তবে অন্য রকমের। অন্তরে নিষ্ঠা ও আত্মনিবেদন নিয়ে কাজ করাও তো

আধ্যাত্মিক আত্মনিয়মন। আমাদের চরম লক্ষ্য ভগবানের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন একত্ব—শুধু ধ্যানে নয়, সকল অবস্থাতে, জীবনের সকল কর্মে।

অনেকে আছেন যাঁরা ধ্যানে বসলে মনে করেন যে এক অতি সুন্দর অবস্থাতে পৌঁছেছেন। তাঁরা বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, জগতকে ভুলে আরামে বসে থাকেন। সে অবস্থাতে কেউ তাদের বিরক্ত করলে, ধ্যান ভঙ্গ হ'ল বলে রাগে অধীর হ'ন। এটা আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ নয়, আত্ম সংযমেরও নয়।...

আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ মানে ভগবানে আত্মনিমজ্জন, যেমন মানুষ সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়। আর এই যে ডুব দেওয়া এ তোমার সিদ্ধিলাভ নয়, এ আরম্ভ মাত্র। তোমাকে শিখতেই হবে ভগবানে নিরন্তর বাস। কি করে শিখবে? সোজা লাফিয়ে পড়, ভেবো না—"কোথায় পড়ব", "কি হবে আমার"? তুমি ইতস্ততঃ করছ বলেই পারছ না—ছেড়ে দাও নিজেকে। সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে গিয়ে যদি ভাব—এখানটায় পাথর আছে, ওখানটায় পাথর আছে—তাহলে আর তোমার ঝাঁপিয়ে পড়া হ'ল না।

প্রশ্ন—যা প্রয়োজন তা ভগবানের নিকট হতে কি ভাবে পাওয়া যায়?

শ্রীমা—যা প্রয়োজন বলতে তুমি কি বোঝ? তুমি ভগবানের দিকে ফিরে বলবে—"আমি এই সম্পর্ক চাই, আমি এই স্নেহ ভালবাসা চাই, আমি এই জ্ঞান চাই, আমি এই বাস্তব সুবিধা চাই।" কিন্তু তুমি কি নিশ্চিত যে ঐ সবের প্রয়োজন আছে? যা বলতে চাইছি তা হচ্ছে সত্যকারের প্রয়োজন—ঐ সম্বন্ধে কোন ধারণা, বাসনা বা অজ্ঞানতা প্রসূত কোন প্রয়োজনের কথা নয়—বাস্তবিক এই সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। শুধু তাই নয়, তুমি সাধারণতঃ বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঐ বিষয়ে পরীক্ষাও কর না। তুমি আশা কর যে তুমি তোমার যা প্রয়োজন বলে মনে কর, ভগবান তাই

তোমাকে দেবেন—অনেক সময় আবার তুমি তাঁর নিকট তা চাও না, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অথচ তুমি প্রত্যাশা কর যে তোমার জীবনের যা কিছু প্রয়োজন তা বাহিরের সকল প্রকার উপায়ের দ্বারাই চরিতার্থ হবে।

তুমি কি ভগবান ও তোমার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছ? তুমি কি তাঁকে চিন্তা কর? অন্তত: কিছুটা সময় বিশ্বস্ততার মনোভাব নিয়ে তুমি কি তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়াও? না—তা তুমি কর না।

প্রকৃতপক্ষে তুমি ঠিক তার উল্টোটা কর। ভগবদ ইচ্ছাকে জানবার ও মানবার ইচ্ছা একেবারেই না করে তুমি ভগবানের ওপর তোমার ইচ্ছাকে চাপাতে চাও, বিশেষ করে যখন তুমি তাঁকে বল—"আমার এর প্রয়োজন আছে।" আর তুমি তাঁর কাছ থেকে জানতে চাও না যে তিনি তোমাকে ঐটি দিতে বা তোমার প্রয়োজন মেটাতে চান কি না? তুমি ভাব যে—"আমার ঐটির প্রয়োজন আছে, সেজন্য ওটি আমি পাবই—আমার তাতে অধিকার আছে—ভগবানেয় দায়িত্বই হচ্ছে যে আমি যেটি চাই আমাকে তা দেওয়া—তা না হলে ঠিক কথা, তিনি ভগবানই নন্।"

কিন্তু ভগবান, ভগবান বলেই, তোমার কি প্রয়োজন—সত্যকারের প্রয়োজন তা ভাল বোঝেন এবং তিনি তাই-ই তোমাকে দেন।

আবার, যদি তুমি তোমার ইচ্ছা তাঁর ওপর চাপাতে চাও, তিনি হয়ত তোমার ইচ্ছামত তা তোমাকে দেবেন—তোমার মনকে আলোকিত করার জন্যে, যাতে করে তুমি তোমার ভুল সম্বন্ধে সচেতন হতে পার, যাতে তুমি বুঝতে পার যে সত্যে পৌঁছিতে হলে তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে [illegible] তার অপেক্ষা সবচেয়ে বেশী হয় এবং তুমি তখন চেঁচাবে

"আঃ ভগবান আমাকে এমন জিনিস দিলেন কেন, যা আমাকে আঘাত করবে?"—একথা তোমার তখন মনে থাকে না যে তুমিই তা চেয়েছ। আবার অপর পক্ষে তুমি যা চেয়েছ, ভগবান যদি তা তোমাকে না দেন, তুমি তখনও প্রতিবাদ করবে ও বলবে—"একি রকম! আমি চাইলাম, আমার এর প্রয়োজন আছে—আর তিনি আমাকে তা দিলেন না?" ভগবান যাই করুন তুমি খালি অভিযোগই করতে থাকবে। কিন্তু এই সকলের পরিবর্তে যদি তুমি তোমার সত্তার সত্য সম্বন্ধে—যা সকল জিনিসের মূল—যা সর্বোত্তম—যা সকল জিজ্ঞাসার উত্তর—যা সকল সমস্যার সমাধান, অল্পবিস্তর যা তুমি অনুধাবন করেছ, তা পাওয়ার জন্যে তুমি ঐকান্তিক ভাবে ও আকুল আগ্রহে আস্পৃহা কর, যদি তোমার মনে এর উপলব্ধির জন্যে ঐকান্তিক আস্পৃহা এসে থাকে, তাহলে তুমি আর ভগবানকে বলবে না—"আমাকে এই দাও বা ওই দাও অথবা আমি এই চাই বা ওই চাই।" তুমি বলবে—"যা প্রয়োজন আমার জন্যে তাই কর এবং আমার সত্তার সত্যের দিকে আমাকে নিয়ে চল; তোমার পরম জ্ঞানে তুমি আমার যা প্রয়োজন বলে মনে করবে তাই আমাকে দিও।"

এই হলেই তুমি আর ভুল করবে না—এবং তুমি এমন কিছু পাবেওনা যা তোমার ক্ষতি করবে।

তুমি সত্যের দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে যেতে পার কিন্তু তার অর্থ হ'ল আত্মনিবেদন ও সমর্পণের পূর্ণতা লাভ। ভগবানকে, আমি এই চাই, ওই চাই বলা অপেক্ষা বিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হওয়াই সত্যকারের পথ।

প্রকৃতপক্ষে কম মানুষই জানে যে তাদের সত্যকারের কি প্রয়োজন। এর প্রমাণ হচ্ছে এই যে তারা সব সময়ই তাদের কামনা পূরণের জন্য ব্যস্ত। তাদের সব চেষ্টাই এই দিকেই নিয়োজিত এবং যে মুহূর্তে একটি বাসনা পূর্ণ হ'ল, অমনি অন্যটির

দিকে তারা ছুট্‌ল।

তারপরে তোমার দিক থেকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর অনেক ভুলের পর, অল্পবিস্তর কষ্ট সহ্যের পর, অনেক হতাশার পর তোমার কখনও কখনও চৈতন্যবোধ আসবে এবং জিজ্ঞাসা করবে—এই অজ্ঞানতা, বাসনা ও প্রয়োজন হতে উদ্ধার পাবার কোন উপায় আছে কিনা?

এই হ'ল সেই ভগবদ্‌ মুহূর্ত যখন তুমি দুহাত প্রসারিত করে বলবে—"এইবারে বুঝেছি আমাকে গ্রহণ কর ও সত্যকারের পথে পরিচালিত কর।"

প্রশ্ন—মা, আমি যদি আন্তরিকভাবে ভগবদকৃপা প্রার্থনা করি—তাহলে তার ফলও নিশ্চয় পাব?

শ্রীমা—সেটা নির্ভর করবে তোমার প্রার্থনার প্রকৃতির ওপর। যদি কেবল কৃপাই চাও বা ভগবানকে ডাক, আর তাঁরই ওপর সব ছেড়ে দাও—তাহলে কোন বিশেষ বিষয়ে ফল আশা করতে পার না। যদি বিশেষ কোন ফলের আশা করতে হয় তাহলে সেই ভাবেই তোমাকে প্রার্থনা করতে হবে। বিশেষ বিষয়টির জন্য তাঁর কাছে তোমার নিবেদন জানাতে হবে। যদি তোমার ভগবদ কৃপার জন্য প্রবল আস্পৃহা হয় ও অন্য কোন কিছু না চেয়ে তারই জন্যে প্রার্থনা জানাও তাহলে তখন ঐ কৃপার ওপরই নির্ভর করতে হবে—তোমার নিজের ইচ্ছামত কিছু হবে না।

প্রশ্ন—ঐ ভাবে চাওয়াই কি ভাল নয়?

শ্রীমা—হাঁ, সেইটাই সব থেকে ভাল চাওয়া। কিন্তু তুমি যদি বিশেষ কিছু চাও তাহলে সেইভাবেই প্রার্থনা করতে হবে। যদি প্রার্থনার বিশিষ্ট কোন কারণ থাকে তাহলে সঠিক ও সুস্পষ্ট ভাবে তার জন্য প্রার্থনা জানাতে হবে।

অবশ্য তুমি যদি পূর্ণ সমর্পিত প্রাণ হয়ে থাক এবং ভগবানের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করে থাক—তাহলে ভগবদ

কৃপার ওপর নির্ভর করে থাক এবং তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ তাকে করতে দাও—আর সেই হবে সবচেয়ে ভাল পথ। কিন্তু এর পরে আর তার কাজ নিয়ে জল্পনা কল্পনা করবে না, তাকে আর বলবে না—"আমি এই বা ঐ পাবার জন্যে প্রার্থনা করেছিলাম।" যদি তোমার কোন কিছু পাবার প্রত্যাশা থাকে তাহলে তা পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সরল ভাবে চাওয়াই ভাল।

এর পরে কৃপাই স্থির করবে যে সে কি করবে না করবে; তোমার যা চাওয়ার তাতো তুমি পরিষ্কার ভাবেই বলেছ—সেজন্য তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

কিন্তু যদি তোমার প্রার্থনা পূরণ না হয় আর তুমি বিদ্রোহ কর—তাহলে সেটাই হবে অন্যায় কাজ। এ হ'লে বুঝতে হবে যে তোমার এষণা বা আস্পৃহা খুব উচ্চ স্তরের নয় এবং হয়ত তুমি এমন কিছু চেয়েছ যা তোমার পক্ষে কল্যাণকর নয়। এ অবস্থায় তোমার পক্ষে বিজ্ঞোচিত হবে এই কথা যে—"তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

কিন্তু তোমার অন্তরে প্রয়োজন অনুভব করলে চাইতে কোনই দোষ নেই। এ তখন হবে সম্পূর্ণ এক স্বাভাবিক গতি। উদাহরণ স্বরূপ যদি তোমার মনে হয় যে তুমি কোন দোষ বা অন্যায় কাজ করেছ এবং আন্তরিক ভাবে চাইছ যেন আর তা না হয়—সে রকম চাওয়াতে আমি কোন দোষ দেখিনা। বাস্তবিক পক্ষে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে যদি তুমি তাই চাও তাহলে তার ফলের আশা তুমি করতে পার।

মনে ভেবোনা যে ভগবান তোমাকে বাধা দেবেন। এ বিষয়ে তাঁর কোন অভিপ্রায়ই থাকতে পারে না। তবে তোমার কিসে মঙ্গল হবে তা তিনি তোমার থেকে ভালই জানেন; নিতান্ত প্রয়োজন হলে তবেই মাত্র তিনি তোমার ইচ্ছার বিরোধিতা করেন—অন্যথায় তুমি যা চাও তাই পূরণের জন্য তিনি সর্বদা ব্যগ্র।

প্রশ্ন—মা, নিজের ইচ্ছা কি ভাবে ভগবদ ইচ্ছার সঙ্গে এক করা যায়?

শ্রীমা—প্রথমতঃ তোমাকে তা চাইতে হবে। তারপরে, এই চাওয়া সব সময় বজায় রাখতে হবে—এ চাওয়ার শেষ হবে না—দুর্দিনে বিপদে এ থেকে বিচ্যুত হওয়া চলবে না—সার্থকতা না আসা পর্যন্ত এ চালিয়ে যেতে হবে। এর সঙ্গে আরও কিছু জিনিসের প্রয়োজন, যথা—অহং থাকবে না; সঙ্কীর্ণমনা হবে না; নিজের পছন্দ অপছন্দে বাস করবে না; বাসনা থাকবে না; মন-কল্পিত মতামতকে প্রশ্রয় দেবে না।

এ দীর্ঘ পথ কারণ প্রকৃতির পরিবর্তন আনতে হবে। মনের সীমার উর্ধে উঠতে হবে, সকল বাসনার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে, দৈহিক পক্ষপাতের অবসান করতে হবে—এই সকলের পরে তুমি ভগবদ ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আশা করতে পার।

আর যখন তুমি তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে, তুমি পূর্ণ ভাবে তাতে বাস করতে থাকবে, অর্থাৎ তুমি তোমার সর্ব সত্বায় এক হয়ে যাবে, সব ইচ্ছা ঐ একটি মাত্র ইচ্ছায় পর্যবসিত হবে; কারণ একমাত্র একীভূত এষণাই ভগবদ এষণার সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে পারে, এক হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন—মানুষের চেতনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কি তার আর্থিক উন্নতি হবে?

শ্রীমা—যদি চেতনার উন্নয়ন অর্থে—বর্ধিত বৃহত্তর চেতনা বোঝায় তাহলে তার ফলে স্বভাবতঃই বাহিরের জিনিসের উপর আরও অধিক নিয়ন্ত্রণ আসবে (আর্থিক অবস্থাসহ)। কিন্তু আবার স্বভাবতই যখন কেউ উন্নত চেতনায় প্রবেশ করে তখন তার আর ঐ সকল জিনিসে—যেমন আর্থিক অবস্থার দিকে, আর কোন দৃষ্টি থাকে না।

প্রশ্ন—এ কি সত্যি নয় যে মানুষ তার চৈত্য-সত্বা সম্বন্ধে, কাজের মধ্যে থাকার সময় অপেক্ষা, ধ্যানে অধিক সচেতন থাকতে পারে?

শ্রীমা—হ্যাঁ, প্রথম প্রথম যখন তুমি একেবারে শিক্ষানবিশী তখনকার

জন্যে একথা সত্য—কিন্তু যখন তুমি চেতনসম্পন্ন হবে তখন তোমার প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে দিন রাত্রি সব সময়েই—কাজের ভিতরে, এমন কি যুদ্ধের সময়ও এবং ধ্যানের ভিতরও সচেতন থাকতে পারবে। চৈত্য সত্তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হলে তোমাকে প্রথমে ধ্যান করতে হতে পারে।

তুমি কাজকে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়—দুই-ই ভাবতে পার। কিন্তু কেবলমাত্র কাজ করার অর্থ কিছুই নয়। আমি তোমাকে বলেছি—সত্তার গভীরে প্রবেশ করে চৈত্য সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হতে হলে তোমাকে ধ্যান করতে হবে—কিন্তু একবার ঐ সংযোগ স্থাপিত হ'লে—তার পরে তুমি ধ্যান কর বা না কর তাতে এসে যায় না।

সাধারণতঃ যখন কেউ গভীরভাবে ধ্যান, নিস্তব্ধতা, নির্জনতার প্রয়োজন অনুভব করে—তখন তার প্রমাণই হচ্ছে যে সে তখনও চৈত্য সত্তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে নি। যদি চৈত্যসত্তা জাগরিত হয় তাহলে তোমার ভিতর এমন কিছু থাকবে যার সব সময়ই অনুভবের শক্তি থাকবে এবং তাই-ই তোমাকে কাজ করিয়ে নেবে। ঐটিই তোমার সব কাজের উৎস হবে—তোমার সমস্ত জীবনকে গড়ে তুলবে। এমন ঘটনা সব আছে যাতে করে মানুষের মন ও প্রাণ যেভাবে সংগঠিত করতে চায়, চৈত্য সত্তা ঠিক সেইভাবে তা করতে দেয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—এই শক্তি তোমাকে তোমার কল্যাণের জন্য ট্রেন ফেল করায় বা সমুদ্র যাত্রায় জাহাজে উঠতে দেয় না। এককথায় তোমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও এ তোমার জীবনকে সংগঠিত করে।

চৈত্য সত্তার উন্মীলন বা সংযোগ জানতে হলে, মানুষ তার কোন সঙ্কট মুহূর্তে কি করে তা দেখতে হবে। সে তখন সাধারণতঃ একাগ্র হবে, তার সমস্ত কর্মশক্তিকে একত্র করে খুবই সক্রিয় ভাবে ঐ অবস্থা হতে উদ্ধারের জন্য অথবা তার

নিষ্পত্তির জন্য ইচ্ছা করবে—তখন হঠাৎই সে দেখতে পাবে আলো ও পথ। এখন যদি সে এই উন্মীলন সম্বন্ধে ও যে সত্তা আলো নিয়ে আসবে তার সম্বন্ধে সচেতন হয় তাহলে তার ভিতরের সব কিছুতে এক প্রকার স্থায়ী চেতনা গড়ে উঠবে—যে চেতনা তার সত্তার সকল অংশকে চালিত করবে।

অধ্যাত্ম জীবনের ভিত্তির জন্য এই-ই যথেষ্ট। কিন্তু তোমার যদি অপর আস্পৃহা সমূহ থাকে তাহলে অবশ্য তোমাকে আরও কাজ করতে হবে। যখন তুমি ধ্যানে বসবে তখনই যে তোমাকে চৈত্য সত্তার অনুভূতি পেতে হবে তার কোন মানে নেই। যে মুহূর্তে চেতনার সকল গতিকে একত্র করে ধরা যাবে তখনই চৈত্য সত্তাকে দেখা যাবে। ধ্যানে এরূপ একাগ্রতা নাও আসতে পারে, এ প্রায়শঃই ঘটে। অপর পক্ষে, যদি তুমি মনোযোগী হও, তুমি তোমার ভিতরে এমন কিছু অনুভব করতে পার, যা ভিতর হতে তোমাকে সমর্থন যোগাবে ও উৎসাহ দেবে।

প্রশ্ন—শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, যে যোগ পথে চলার পূর্বে প্রথমে ডাক আসতে হবে এবং তাতে নিজের আত্মার উত্তরের সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে, তা না হ'লে সর্বনাশ হবে—কিন্তু কি করে জানব যে ডাক সত্যই এসেছে ?

শ্রীমা—শ্রীঅরবিন্দ যা বলেছেন তার অর্থ এই যে, মানসিক উচ্চাশা অথবা প্রাণিক ইচ্ছাকে আধ্যাত্মিক পথের ডাক বলে ভুল যেন না করা হয়। আধ্যাত্মিক পথের ডাক ঠিক সময়ে নিজেই বোঝা যাবে —তখন আত্মা তার সম্মতি জানাবে, ঐ পথে তার যাত্রারম্ভ হবে। এ উচ্চাশা, গর্ব অথবা অভিলাষের দ্বারা প্রতারিত হবে না, এবং যে পর্যন্ত না ঐ পথে চলার জন্য ভগবদ নির্দেশ শুনতে পাবে ততক্ষণ সে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করবে, কারণ সে জানে যে সময়ের পূর্বেই যাত্রা আরম্ভ করলে তা ব্যর্থ হবে এবং ক্ষতিকরও হবে।

প্রশ্ন—কেউ কেউ কাজে আনন্দ পায়, আবার কেউ কেউ কাজের

থেকে অবসর নিলে আনন্দ পায়—কেন ?

শ্রীমা—অনেক মানুষ আছে যারা কাজে আনন্দ পায়—তাদের পক্ষে কাজই আনন্দদায়ক। অন্যেরা ধ্যানে বসে ভগবানের সঙ্গে তাদের চেতনা যুক্ত করে ধ্যানের আনন্দ লাভ করে। প্রার্থনা বলে যে এই দুই প্রকারের আনন্দ লাভ করাই হ'ল আদর্শ। অনেক মানুষ আছে যারা পালা করে এই দুই প্রকারের আনন্দই লাভ করে। অর্থাৎ যখন তারা কাজ করে, তারা কাজের আনন্দ লাভ করে—আবার যখন তারা ধ্যান করে তখন তারা অন্য এক প্রকারে আনন্দ পায়। কিন্তু আদর্শ অবস্থায়, চেতনার গভীরে ধ্যান ও সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করে কিন্তু বাহিরে প্রকৃতি সকল প্রকার কাজে ব্যাস্ত থাকে ও কাজের আনন্দ উপভোগ করে। প্রথমে তোমাকে একটা নিয়ে আরম্ভ করতে হবে—হয় কাজ আর না হয় ধ্যান। কিন্তু তুমি যদি নমনীয় হও, তাহলে তুমি দু-ইই একসঙ্গে পেতে পার। তোমার সত্তার যে অংশ বাহিরে ফেরান আছে তা অনেক প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসে রত থাকে। কিন্তু গভীরে থাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, নীরবতা ও সর্বপ্রকার বস্তু হতে মুক্ত অবস্থা। মনে হয় ও দুটি পরস্পর বিরোধী কিন্তু যখন তাদের সংযোগ হয় তখন সৃষ্টির প্রকৃত আনন্দ তারা উপভোগ করে। অবশ্য উপলব্ধি নিজে থেকে বা হঠাৎ আসে না—সাধনা করলে তবেই তা আসে—মনোযোগ অভ্যাস করলে তবেই তা আসে। এই অনুভূতি যতদিন না আসে ততদিন মানুষ তর্ক করে যে কাজ ও যোগ পরস্পর সুসঙ্গত বা অসঙ্গত কিনা।

প্রশ্ন—যোগে দুটি পথ আছে, একটি তপস্যার, অন্যটি সমর্পণের। এখন সমর্পণ কি ? এর অর্থ কি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে ভগবানকে দিয়ে দেওয়া ?

শ্রীমা—হাঁ, যদি তুমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানকে দিয়ে দাও তাহলে তিনিই যোগ করতে থাকবেন, তখন আর তুমি যোগ

করবে না—সেজন্য এ বেশী কঠিন নয়। কিন্তু তুমি যদি তপস্যা কর তাহলে এ তুমিই, যে যোগ করবে এবং তোমার নিজেকেই সব দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে—এখানেই সব কিছু বিপদ নিহিত রয়েছে। কিন্তু এমন মানুষ অনেক আছে যারা সমস্ত কিছু বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সব দায়িত্ব নিজেরা নেয়—কারণ তারা স্বভাবে স্বাধীনচেতা। আর তাদের এ বিষয়ে ব্যস্ততাও নেই—যদি বহুজন্ম ধরেও এর জন্য চেষ্টা করতে হয় তাতেও তারা পিছপা নয়। কিন্তু এমন অনেকে আছে যারা দ্রুত ফল চায় এবং লক্ষ্যে তাড়াতাড়ি ও নিশ্চিত পৌঁছিতে চায়—তারাই ভগবানের ওপর সব দায়িত্বভার অর্পণ করে।

প্রশ্ন—এমন কিছু চিহ্ন আছে যার দ্বারা বোঝা যায় যে এই পথে যাবার জন্য কেউ প্রস্তুত হয়েছে—বিশেষ করে যদি তার আধ্যাত্মিক গুরু কেউ না থাকেন?

শ্রীমা—হাঁ, এর সবচেয়ে বড় লক্ষণ হচ্ছে সর্বাবস্থায় আত্মার সমতা। এই-ই হচ্ছে নিশ্চিত অপরিহার্য ভিত্তি; যেন কোন কিছু শান্ত নীরব শান্তিপূর্ণ, যেন এক বিরাট শক্তির অনুভূতি লাভ। এ জড়তা থেকে আসা স্থিরতা নয় কিন্তু এ একটা কেন্দ্রীভূত শক্তির বোধ—যা তোমাকে সব সময় স্থির ধীর রাখবে, যা কিছু ঘটুক না কেন, এমন কি তা থাকবে তোমার জীবনের সবচেয়ে বিপর্যয়ের মধ্যেও। এই-ই হচ্ছে প্রথম লক্ষণ।

দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে—তোমার বোধে আসবে যে তুমি যেন তোমার সাধারণ স্বাভাবিক চেতনায় বন্দী হ'য়ে আছে—যেন শক্ত কোন কিছুর মধ্যে আটকে আছ। যেন কষ্ট অসহ্য মনে হবে—তুমি চেষ্টা করবে এ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে কিন্তু তুমি বেরিয়ে আসতে পারবে না। সাধারণ জীবন, সাধারণ কাজকর্ম, সাধারণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক সব এত ছোট, এত অকিঞ্চিৎকর মনে হবে যে তুমি ভিতরে শক্তি অনুভব করতে থাকবে এইসব হ'তে

বেরিয়ে আসার জন্য।

অন্য আর একটি লক্ষণও আছে। যখন তুমি একাগ্র হও এবং আস্পৃহা কর—তখন মনে হবে যেন কোন কিছু তোমার ভিতরে নেমে আসছে—তুমি যেন উত্তর পাচ্ছ। যেন তুমি আলো ও শান্তি অনুভব করছ—শক্তি নেমে আসছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এক আভ্যন্তরীণ আস্পৃহা—এক আহ্বান ভিতর থেকে উত্থিত হবে। অর্থ এই যে সম্পর্ক বেশ ভাল ভাবেই স্থাপিত হয়েছে।

প্রশ্ন—প্রকৃত অধ্যাত্ম পথে প্রবেশ লাভ হয়েছে একথা কখন বলা যেতে পারে ?

শ্রীমা—এর প্রথম চিহ্ন (যদিও তা প্রত্যেকের বেলায় এক নয়) এই যে তখন অপর সব কিছুই তোমার নিকট মূল্যহীন বলে বোধ হবে। তোমার সমস্ত জীবন, তোমার সমস্ত কাজকর্ম তোমার সমস্ত গতি প্রকৃতি চলতে থাকবে—কিন্তু তা সবই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হবে—তা আর তখন তোমার অস্তিত্বের মূল বস্তু হ'য়ে থাকবে না। আমার বিশ্বাস এই হচ্ছে প্রথম চিহ্ন।

আবার এও হ'তে পারে··—সব কিছুই যেন ভিন্ন বোধ হ'তে থাকবে, জীবনযাত্রা ভিন্ন বোধ হবে, মনে একটা আলোক আসবে যা পূর্বে ছিল না—হৃদয়ে শান্তি আসবে যা পূর্বে ছিল না। এতে কিন্তু পরিবর্তন আসবে না—নিশ্চিত পরিবর্তন পরে আসবে —খুব কম সময়েই তা প্রথমে আসে।

প্রশ্ন—তপস্যার প্রকৃত অর্থ কি ?

শ্রীমা—ভগবানকে পাওয়ার জন্য নিজের ওপর যে নিয়মানুগ অভ্যাস আরোপ করা হয় তাহাই তপস্যা।

প্রশ্ন—তপস্যা ও আস্পৃহা কি এক জিনিস ?

শ্রীমা—না, আস্পৃহা ছাড়া তুমি তপস্যা করতে পারেনা। আস্পৃহাই হচ্ছে প্রথম—কোন কিছু পাওয়ার জন্য অভীপ্সা। তপস্যা হচ্ছে —পদ্ধতি—এ এক নিয়ম।

প্রশ্ন—চেতনার পরিবর্তন আনতে হ'লে কি করতে হবে?

শ্রীমা—এর বহু পথ বিদ্যমান। প্রত্যেকে তার নিজের নিজের প্রকৃতি অনুসারে পথ ঠিক করে নেবে। সাধারণতঃ পথের ইঙ্গিত অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনিই এসে উপস্থিত হয়। চৈত্য সত্তার সঙ্গে সংযোগ সকলের পক্ষে সর্বোত্তম পথ, যা প্রত্যেকেরই সাধ্যের মধ্যে এবং তা তাদের ধৈর্যের সঙ্গে অনুসরণ করতে হবে।

স্বপ্নে, অনুভূতির মাধ্যমে, কোন কিছু শোনা ও জানার মাধ্যমে, সুন্দর সঙ্গীত, বাক্য, অথবা চেষ্টার মাধ্যমে এক বিশেষ গভীর একাগ্রতা লাভ করা যায়—কোন্ দিক থেকে এই সুযোগ আসবে তার কিছু ঠিক নেই—হাজারো কারণে ও হাজারো দিক থেকে এ আসতে পারে। তোমাকে কেবল জাগ্রত ও অনুসন্ধিৎসু হয়ে থাকতে হবে—তবেই সাফল্য লাভ করবে।

প্রশ্ন—অ্যাধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করতে হলে কিসের আবশ্যক?

শ্রীমা—আন্তরিকতা! আন্তরিকতা! যা হবে পূর্ণ ও শর্তহীন। একমাত্র আন্তরিকতাই তোমার আধ্যাত্মিক জীবনকে রক্ষা করতে পারবে। তুমি আন্তরিক না হ'লে দ্বিতীয় ধাপ উঠতে না উঠতে তোমার পতন হবে। সেজন্য পূর্বেই স্থির নিশ্চয় হও এই পথে তুমি আন্তরিক কিনা? তুমি আরও অধিক পরিমাণে আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ কর কিনা?

প্রশ্ন—সাধককে কি আস্পৃহা নিয়েই জন্মাতে হবে না?

শ্রীমা—না, আস্পৃহাকে বর্ধিত করতে হয়—সত্তার অন্যান্য কাজের মত। হয়ত তুমি খুব সামান্য আস্পৃহা নিয়ে জন্মেছ, কিন্তু তাকে এমন ভাবে বর্ধিত ক'রে তুলবে যেন সে খুব বড় হ'য়ে ওঠে। তুমি হয়ত খুব অল্প ইচ্ছাশক্তি নিয়ে জন্মেছ এবং চেষ্টা করলে তুমি তাকে খুব বাড়াতে ও শক্তিশালী করতে পারবে। তোমার মনের এ ধারণা ঠিক নয় যে এ তোমার কাছে কৃপার মতন নেমে আসবে—তোমাকে যদি আস্পৃহা না দেওয়া হয় তাহলে তুমি

আর তা পাবে না—এ সত্য নয়। শ্রীঅরবিন্দ সব সময়েই বলেছেন যে তোমাকে বেছে নিতে হবে—এবং সর্বদাই তোমাকে তা করতে হবে—যদি তুমি না শেখ তাহলে তুমি অগ্রসর হ'তে পারবে না। তুমি সত্যের সেবক হবে কিনা এ তোমাকেই ঠিক করতে হবে—তোমার সমর্পণ পূর্ণ করতে হলে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তোমাকেই সঙ্কল্প করতে হবে সমর্পণ পূর্ণ করার জন্য—তা না হ'লে নিজে থেকে তা পূর্ণ হবে না। যখন সমর্পণ পূর্ণ হবে তখন তোমার ভিতরে জ্ঞানও আসবে—তখন তুমি দিব্যের সঙ্গে এক হবে। কিন্তু যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ তোমাকে ইচ্ছা করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে ও ঐ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১২

অতিমানসের অবতরণ

"একই কর্মের জন্ম আমাদের জন্মগ্রহণ ও জীবনধারণ—জগৎকে ভগবানের কাছে, মৃত্যুহীন জ্যোতির মধ্যে তুলে ধরতে, ভগবানকে এই জগতে নামিয়ে আনতে পৃথিবীর মধ্যে আমরা এসেছি—এসেছি পার্থিব জীবনকে দিব্য জীবনে পরিবর্তিত করবার জন্তে।"

—সাবিত্রী

আশ্রমের দিব্য কর্মধারা এগিয়ে চলেছে—সব ভার শ্রীমা একাই বহন করে চলেছেন—শ্রীঅরবিন্দ গভীরতম সাধনায় মগ্ন—মায়ের পরিচালনায় অন্য সকলের সাধনা ও কর্ম এগিয়ে চলেছে—এরই মধ্যে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের ৭৫তম জন্ম দিবসে ঘোষিত হ'ল ভারতের স্বাধীনতা—যেন শ্রীঅরবিন্দের জন্ম ও ভারতের স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা। শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ও পরে তাঁর সাধন জীবনে ভারতের মুক্তির জন্য যে অনন্ত সাধনা করেছিলেন তারই জন্য শ্রীভগবান তাঁরই জীবিতকালে ঠিক এই দিনটিতেই ভারতকে স্বাধীন করলেন। শ্রীঅরবিন্দ বললেন—

"এই দিনটি যে এত গুরুত্ব পেল তা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে আনন্দের কারণ—কিন্তু নিছক ওটা যে এই দিনেই আকস্মিক ভাবেই ঘটে গেল তা নয়, এ ভগবৎ শক্তির অমোঘ বিধানেই হয়েছে।"

ভারতের স্বাধনতা প্রাপ্তিতে মা খুবই উল্লসিত—ইতিমধ্যে মা ভারতকে তাঁর নিজের দেশ বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর অন্তরের অন্তস্থল হতে ভারতাত্মা পরমা মাকে পরম শ্রদ্ধা জানিয়ে আকুল প্রার্থনায় ডেকে বলছেন—

"ওগো আমাদের মা! ওগো ভারতাত্মা মা জননী! নিদারুণ

শ্রীঅরবিন্দ—১৯৫০

দুঃখের ও হতাশার দিনগুলিতে তুমি তোমার সন্তানদের পরিত্যাগ করো নি—এমন কি যখন তারা তোমার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, অন্য প্রভুর সেবা করেছে, তোমাকে অস্বীকার করেছে—তখনও তুমি তাদের ত্যাগ করোনি। এখন যখন তারা জেগে উঠেছে ও তোমার মুক্তির প্রভাতে যখন তোমার মুখমণ্ডল আলোকে ঝলমল করছে—এই শুভ কল্যাণকর মুহূর্তে আমি তোমাকে জানাই আমাদের অসীম ভক্তি ও প্রীতি।

মা! তুমি আমাদের পরিচালনা কর যাতে করে স্বাধীনতার আকাশ, যা আমাদের নিকট উন্মুক্ত হয়েছে তা যেন সত্যকার মহত্বের আকাশরূপে দেখা দেয় এবং জাতিপুঞ্জের জীবনে তোমার সত্যকারের জীবন প্রতিভাত হয়। ওগো মা! আমাদের জীবন সেইভাবে পরিচালিত কর যাতে ক'রে আমরা সর্বকালে সর্ব সময়ে মহৎ আদর্শ নিয়ে চলি ও মানুষকে দেখাতে পারি তোমাকে অধ্যাত্ম পথের পথিকৃৎরূপে ও সকল মানবের সাহায্যকারী বন্ধুভাবে।"

মা বললেন—"ভারতই একমাত্র জগতকে সত্যের পথ দেখাতে পারে। পশ্চিমের বস্তুতান্ত্রিকতার অনুকরণ না করে ভারতই একমাত্র পারে ভগবৎ শক্তি ও এষণার প্রকাশ ঘটিয়ে জগতে তাঁর বাণী প্রচার করতে। ভারতই আধ্যাত্মিকতার পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে জগতকে পথ দেখাবে ও জগতের ঐক্য সাধন করবে।"

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মা আরো বললেন—"ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ভারত পৃথিবীর শিক্ষাদাত্রী—গুরু। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ভারতের ওপর—ভারত পৃথিবীকে ঢেলে দেবে তার অধ্যাত্ম সম্পদ। ভারত সরকারেরও উচিত এ দিকের তাৎপর্য অনুধাবন করা এবং সেই দিক থেকে তাদের নিয়ন্ত্রিত করা।"

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি পরবর্তীকালে, ১৯৬৫ সনে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে শ্রীমা ঘোষণা করেছিলেন—"সত্য ও সত্যের বিজয়ের জন্যই ভারত যুদ্ধ করছে এবং তা সে করবে যতদিন না

ভারত ও পাকিস্তান এক হবে —কারণ ভারতের সত্তাতে সেইটাই একমাত্র সত্য।”

তিনি আরও বললেন—“সব কিছু সত্বেও ভারতের একটিই আত্মা —যতদিন না আমরা বলতে পারব, ভারত এক ও অবিভাজ্য ততদিন আমাদের ঘোষণা করতে হবে, ভারতের আত্মা চিরঞ্জীব হউক—ভারত এক ও অবিভাজ্য—ভারত জগতে তার ঈশ্বর নির্দিষ্ট কাজ সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন। জগতের মঙ্গলের জন্যই ভারতকে বাঁচতে হবে—কারণ ভারতই একমাত্র জগতে শান্তি ও নূতন ধারা প্রবর্তনে সক্ষম।”

ঘটনা প্রবাহ এগিয়ে চলেছে—আশ্রমের কাজ ও সাধনা যথারীতি সুসম্পন্ন হচ্ছে মায়ের সুদক্ষ পরিচালনায় ও নির্দেশে—দেখতে দেখতে ১৯৫০-এর ২৪শে নভেম্বর দর্শন দিবস এসে উপস্থিত হ'ল—কিন্তু শোনা গেল শ্রীঅরবিন্দ অসুস্থ, কিন্তু তা সত্বেও তিনি শিষ্যভক্তজনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে দর্শনে বসাই স্থির করলেন। ভক্তজন তখন স্বপ্নেও ভাবেন নি পৃথিবীতে এই তাদের শেষ বারের মত দেবদর্শন। সকলেই নিশ্চিন্ত ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগে রোগ নিরাময় করবেন—কিন্তু মানুষের বুদ্ধির অগম্য কারণে সেই আশায় সকলকেই নিরাশ হতে হল।

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের দেহে অধিমানস শক্তি নামার বার বছর অতিবাহিত হবার পর মায়ের মনে হল অতিমানস সিদ্ধি আসন্ন। মা পরবর্ত্তীকালে বললেন—“১৯৩৮ সনে আমি শ্রীঅরবিন্দের ভিতরে অতিমানস শক্তির অবতরণ দেখেছি। যা তখনও সমাধান করতে পারা যায়নি তা হ'ল—ঐ শক্তিকে পৃথিবীতে স্থায়ী করা।”

যে ভাবে পরে অতিমানস শক্তি পৃথিবীতে নামান হল তা অবশ্যই মানুষের মন ও বুদ্ধির অগম্য। এর পরে আরও বার বছর কেটে গেল —শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দেহ ত্যাগ করলেন—আপাতঃ দৃষ্টিতে তিনি অসুখে দেহ ত্যাগ করলেন এ কথা মনে হলেও তাঁর দিক থেকে ঐ ঘটনা প্রকৃতই এক বৃহত্তম ও মহত্তম ত্যাগেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অব-

তরণরত অতিমানস শক্তিকে গ্রহণ ও ধারণ করতে পৃথিবী তখনও প্রস্তুত হয়নি—সেই জন্যই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মরণশীল ভাগ্যের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে নিয়ে নিজে অতিমানস শক্তিকে টেনে নিজের দিব্য দেহে নামিয়ে আনলেন—এবং দেহত্যাগ দ্বারা মূলতঃ ও কার্যতঃ নিজের ঐ শক্তিকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে অতিমানস জ্যোতিঃকে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে দিলেন।

এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি এই প্রচণ্ড সংক্ষিপ্ত পথ গ্রহণ করেছিলেন—অন্যথায় ওর ধারে কাছে পৌঁছিতে আরও কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে যেত। যে মুহূর্তে তিনি তাঁর জড় আবরণ ছেড়ে গেলেন সেই মুহূর্ত হ'তে অতিমানস জ্যোতিঃ মায়ের দেহে স্থায়ী হয়ে আসন গ্রহণ করল।

বস্তুতঃ শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমায়ের পূর্বে এই উচ্চতম শক্তি, যাকে শ্রীঅরবিন্দ অতিমানস নামে অভিহিত করেছেন, তাকে এই পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে এনে জড় দেহের দিব্য রূপান্তরসহ সমগ্র জীবনের রূপান্তর ঘটিয়ে একই সঙ্গে জগতের সকল মানবের মুক্তি পথ উন্মুক্ত করার চিন্তা বা পরিকল্পনা আর কেউ কোন দিন করেন নি।

৫ই ডিসেম্বর অতি প্রত্যুষে আশ্রমের সকল দরজা খুলে দেওয়া হ'ল—যাতে সকলে পরম গুরুকে শেষ দর্শন ও প্রণাম করতে পারেন। আশ্রমবাসীরা বিস্ময় বিমূঢ়—স্তব্ধ হয়ে শুনলেন মহামানবের মহাপ্রয়াণের সংবাদ। সারা ভারত ও জগৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে জানল মহামানবের তিরোধান কথা। মানুষ জানল না যে পৃথিবীর গ্রহণ-সামর্থ্যতার অভাবের জন্যই শ্রীঅরবিন্দকে এই চরম পথ অবলম্বন করতে হয়েছে।

মা বললেন—"জগত জানে না যে জগতের জন্য কি প্রচণ্ড ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছেন। প্রায় এক বৎসর পূর্বে যখন আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম তখন আমি কথায় কথায় বলি আমার মনে হচ্ছে আমি এই দেহ ত্যাগ করব। তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন, না এ

কখনই হবে না। যদি এই রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন হয় তাহলে আমি যেতে পারি—তোমাকে আমাদের অতিমানস যোগের অরোহণ ও রূপান্তরের কাজ শেষ করতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দের মর দেহ অতিমানসের জ্যোতিঃতে জ্যোতির্ময় হয়ে রইল, দীর্ঘ চারদিন কোন বিকৃতির লক্ষণই দেখা গেল না সেই দেব দেহে। মা তাঁর পরম গুরুকে উদ্দেশ করে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতিতে অতিমানস রূপান্তরের কাজ সমাধানের জন্য আকুল প্রার্থনা জানালেন—প্রার্থনার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ মাকে আশ্বস্ত করে জানালেন যে তাঁর কাজে শ্রীঅরবিন্দ সক্রিয় ভাবে উপস্থিত থাকবেন—সেই কথাই মা বলছেন তাঁর বাণীতে—

"হে প্রভু আজ সকালে তুমি আমাকে নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছ যে তোমার আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমাদের মধ্যেই অবস্থান করবে, কেবল আলো ও পথ নির্দেশক চেতনাতেই নয়, পরন্তু তোমার বাস্তব রূপের সক্রিয় উপস্থিতিতে। অভ্রান্ত উক্তির দ্বারা তুমি এই অঙ্গীকার দিয়েছ যে তোমার সম্পূর্ণটাই এখানে থাকবে, পৃথিবীর রূপান্তর না আসা পর্যন্ত তুমি পৃথিবীর আবহাওয়া ত্যাগ করে যাবে না। প্রার্থনা করি যেন তোমার এই উপস্থিতির যোগ্য হয়ে আমরা এখন থেকে তোমার কাজকে সম্পূর্ণ করে তোমার জন্যে নিজেদের সর্বতোভাবে নিয়োজিত করতে পারি।"

এর পরে মা আত্মস্থ হলেন—সকলকে শোক করতে নিষেধ করে এক বাণীতে মা বললেন—"শ্রীঅরবিন্দের জন্য শোক করা মানে তাঁকে অসম্মান করা, কারণ তিনি আমাদের মাঝে সচেতন জীবিতই আছেন।"

মা আরও বললেন—"পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষের গ্রহিষ্ণুতার অভাব রয়েছে বলেই শ্রীঅরবিন্দকে দেহ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।"

৯ই ডিসেম্বর ১৯৫০, শ্রীঅরবিন্দের দেব দেহ সমাহিত করা হ'ল।

মহাসমাধিতে নিমগ্ন রইলেন মহাযোগী—যেখানে জগতের সকল মানুষ, সকল প্রাণী, সকল বস্তুর পক্ষ হতে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মহাসমাধি গাত্রে উৎকীর্ণ করলেন মা শ্রদ্ধাঞ্জলি :

"হে আমাদের ভগবানের জড় আবরণ ! তোমাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

তুমি যে আমাদের জন্য এত করেছ—এতখানি কাজ করেছ, যুদ্ধ করেছ, কষ্ট করেছ, আশা করেছ, সহ্য করেছ, তুমি যে সব সঙ্কল্প করেছ, চেষ্টা করেছ, তৈরি করেছ, সংসিদ্ধ করেছ আমাদের জন্যে ; তোমার সম্মুখে প্রণত: আমরা, আর এই প্রার্থনা তোমার কাছে—আমরা যেন কখনও ভুলে না যাই এক মুহূর্তের জন্যও, তোমার কাছে সব কিছুর জন্যে কত আমরা ঋণী।"

মায়েরই নির্দেশে আশ্রম প্রাঙ্গণে সেবা বৃক্ষের নীচে যে মহাসমাধি রচিত হ'ল আজ তা এক অনবদ্য তপঃভূমি—সাধনার পীঠস্থান—শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের চেতনার স্পর্শ মেলে এই সমাধি স্পর্শে—শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের চেতনা এখানে এক হয়ে আছে।

বিশ্বে এ এক অপূর্ব সমাধি—জীবন্ত, প্রাণবন্ত, অধ্যাত্ম আলোকে ও রশ্মিতে ভরপুর—যার কোন তুলনা জগতে কোথাও নেই ! মুমুক্ষু সাধক ও ভক্ত এই সমাধির বুকে ধূপ জ্বালিয়ে দিয়ে নিজের অন্তরে সেই ধূপের দীপ জ্বালিয়ে নিয়ে সাধনক্ষেত্র হতে অপূর্ব অনুভূতি নিয়ে ঘরে ফিরে ধন্য হয়।

আশ্রম আবার চলতে থাকে পূর্বেরই মতন—মা একাই দর্শনে বসেন—সবাই জানেন শ্রীঅরবিন্দও আছেন মায়ের চেতনায় এক হয়ে। দর্শন দিবসেরও কোন পরিবর্তন হয় না। আশ্রম আরও বিস্তৃত হতে থাকে—শ্রীঅরবিন্দের আরব্ধ কাজ মায়ের দিব্য পরিচালনায় দিব্য-ভাবেই অগ্রসর হয়ে চলে—আশ্রম তথা পণ্ডিচেরী অতিমানস চেতনার অভিব্যক্তির এক পীঠস্থানে পরিণত হয়—মা বললেন—"এ হ'ল দিব্য উপলব্ধির স্থান—দিব্য অভিজ্ঞতার স্থান।"

শ্রীমায়ের দিব্য কর্মধারা অব্যাহত রইল—সঙ্গে সঙ্গে চলল তাঁর অভিনব সাধনা—অতিমানস শক্তিকে পৃথিবীর মাটিতে স্থায়ী করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দের ঈপ্সিত কাজ—জগতের রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দের যোগের তিনিই যুগ্ম সহযোগী—সেই কোন ১৯২১ সন হ'তে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে একযোগে—তারও পূর্বে পণ্ডিচেরীতে তাঁর প্রথম আগমন কাল ১৯১৪ সনে নিজের সকল পূর্বার্জিত সাধনা ও সিদ্ধি পূর্ণ লয় করে—শ্রীঅরবিন্দ-ধারায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দিয়ে—আবার তারও পূর্বে তাঁর সেই তের বছর বয়সের সময় হতে ধ্যান নেত্রে দেখা তাঁর পরম গুরু শ্রীঅরবিন্দের যোগপথ পূর্ণ সমর্পণের যোগপথ গ্রহণ ক'রে—পরিপূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে উভয়ের যোগ তপস্যাকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন—আর আজ শ্রীঅরবিন্দ দেহাতীত হ'লেও তাঁর চেতনার সক্রিয় উপস্থিতিতে মা এগিয়ে চলেছেন ধ্যান তপস্যার একটার পর একটা শৃঙ্গ অতিক্রম করে'—অতিমানসের স্বর্ণ দুয়ারের অভিমুখে। মানবের বিবর্তনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—জগতে এক নূতন আলো ফুটে উঠ্‌ল, মা তাঁর পরম গুরু শ্রীঅরবিন্দকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ১৯৫৬ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী নিবেদন করলেন—

> "হে প্রভু তুমি যা চেয়েছিলে আমি তা সম্পন্ন করেছি,
> এই পৃথিবীতে এক নূতন আলো ফুটে উঠেছে, এক
> নূতনজগৎ এবার জন্ম নিয়েছে, যা কিছু প্রতিশ্রুতি
> তুমি দিয়েছিলে, তা সবই প্রতিপালিত হয়েছে।"

শ্রীঅরবিন্দের ঈপ্সিত অতিমানস জ্যোতিঃ ও শক্তিকে মা পৃথিবীর চেতনায় নামিয়ে আনলেন—স্থায়ী করলেন—এক নূতন যুগের সূচনা হ'ল—মানুষের দিব্য জীবনে উত্তরণের স্বর্ণ দুয়ার উন্মুক্ত হ'ল।

মায়ের অতিমানস সাধনা নিত্য নবরূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছে—নিত্য নব অনুভূতিতে মা সঞ্জীবিত—১৯৫৮ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে মা বললেন—

"অতিমানস জগতে স্থায়ী ভাবেই আছে—এবং আমিও সেখানে অতিমানস দেহে স্থায়ীভাবেই বর্তমান আছি। তার প্রমাণ আবার আমি আজই পেলাম যখন আমার পার্থিব চেতনা সেখানে নিরুদ্ধ হয়ে রইল অপরাহ্ন ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত। আমি জানতে পারলাম যে এই দুই জগৎ—জড় ও অতিমানস জগতের মধ্যে সকল সময় চেতন সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে প্রয়োজন এক মধ্যবর্তীজগতরূপ সংযোগ সেতুর। আমাদের ব্যষ্টি চেতনাতে ও বাস্তব জগতে এই মধ্যবর্তী স্তর গড়ে তুলতে হবে আর তা গড়ে তোলাও হচ্ছে। এর পূর্বে যখনআমি 'নূতন পৃথিবী' গড়ার কথা বলেছিলাম তখন আমি ঐ মধ্যবর্তী স্তর বা জগতের কথাই বলেছিলাম। যখন আমি এই দিক থেকে অর্থাৎ দেহচেতনার দিক থেকে দেখি, তখন দেখি অতিমানস শক্তি, জ্যোতিঃ ও পদার্থ নিচয় অবিরাম জড়ে অনুপ্রবেশ লাভ করছে—সঙ্গে সঙ্গে আরও দেখি এই মধ্যবর্তী জগতও রূপায়িত হয়ে চলেছে এবং আমি নিজেও তাতে অংশ গ্রহণ করছি।"

মা প্রকাশ করলেন—এই ৩রা ফেব্রুয়ারীর অভিজ্ঞতা তাঁর নিকট এক বিস্ময়কর তথ্যের উদ্ঘাটন—আর তিনি নিজেও এর ভিতর হ'তে এক নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

১৯৫৮ সনের ১৩ই নভেম্বর অপর এক অভিজ্ঞতার আলোকে মা নিশ্চিত হলেন যে বিশ্বের ইতিহাসে সেই ক্ষণ এসেছে যে সময় ঐ সংযোগ সেতুর স্থাপনা সম্ভব হয়েছে।

১৯৬০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মা বর্ণনা করছেন, কেমনভাবে তিনি ঠিক চার বৎসর পূর্বে ১৯৫৬ সনের ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সমবেত ধ্যানে মগ্ন থেকে অতিমানস শক্তিকে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, মা বললেন—

"ঐ সন্ধ্যায় তোমাদের মধ্যে ভগবদ উপস্থিতি ছিল মূর্ত ও বাস্তব আমার দেহ হয়ে উঠল যেন পৃথিবীর চেয়ে আকারে বড়—রং তার নিকষ কাঞ্চন—আমি এসে দাঁড়ালাম এক বিরাট স্বর্ণ দুয়ারের

সামনাসামনি—যে হেমকান্তি দুয়ার পৃথিবী আর ভগবানকে রেখেছে পৃথক করে।

যেমনি আমি ঐ স্বর্ণ দুয়ারের দিকে দৃষ্টিপাত করেছি—তখনই চেতনায় স্পন্দনে বোধ এল যে সময় আসন্ন—সেই ইঙ্গিত গ্রহণ করলাম ও ইচ্ছা করলাম আর তারই সঙ্গে দুহাতে তুলে ধরলাম এক বিরাট সোনার মুগুর—এক আঘাত, বদ্ধ দুয়ারের ওপর একটি মস্ত আঘাত হানতেই দরজা খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ওপর অবিরাম জলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় নেমে এল অতিমানস জ্যোতিঃ, শক্তি ও চেতনা।"

এর শক্তি ও কর্মধারা আজ হয়ত ঠিক বোধে আসছে না কিন্তু মা বলেছেন—"একদিন আসবে যখন অন্ধ যে, অচেতন যে, অনিচ্ছুক যে সেও একে জানতে, অনুভব করতে বাধ্য হবে।"

সেই কোন ১৯১৪ সনের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের ধ্যান লিপিতে মা তাঁর দয়িতের নিকট প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন—

"এক নূতন আলো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক !
এক নূতন পৃথিবী জন্ম নিক্ !"

তাঁর দয়িত ভগবান তাঁর সেই প্রার্থনা পূরণ করলেন—অতিমানস জ্যোতির ছটায় বিশ্ব উজ্জ্বল হয়ে উঠ্ল, শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমায়ের দীর্ঘ যুগ্ম সাধন তপস্যা এগিয়ে চল্ল সফলতার আলোকে।

ভগবতী মা—পরম উপলব্ধিতে

মাতৃমন্দির—অরোভিল

১৩
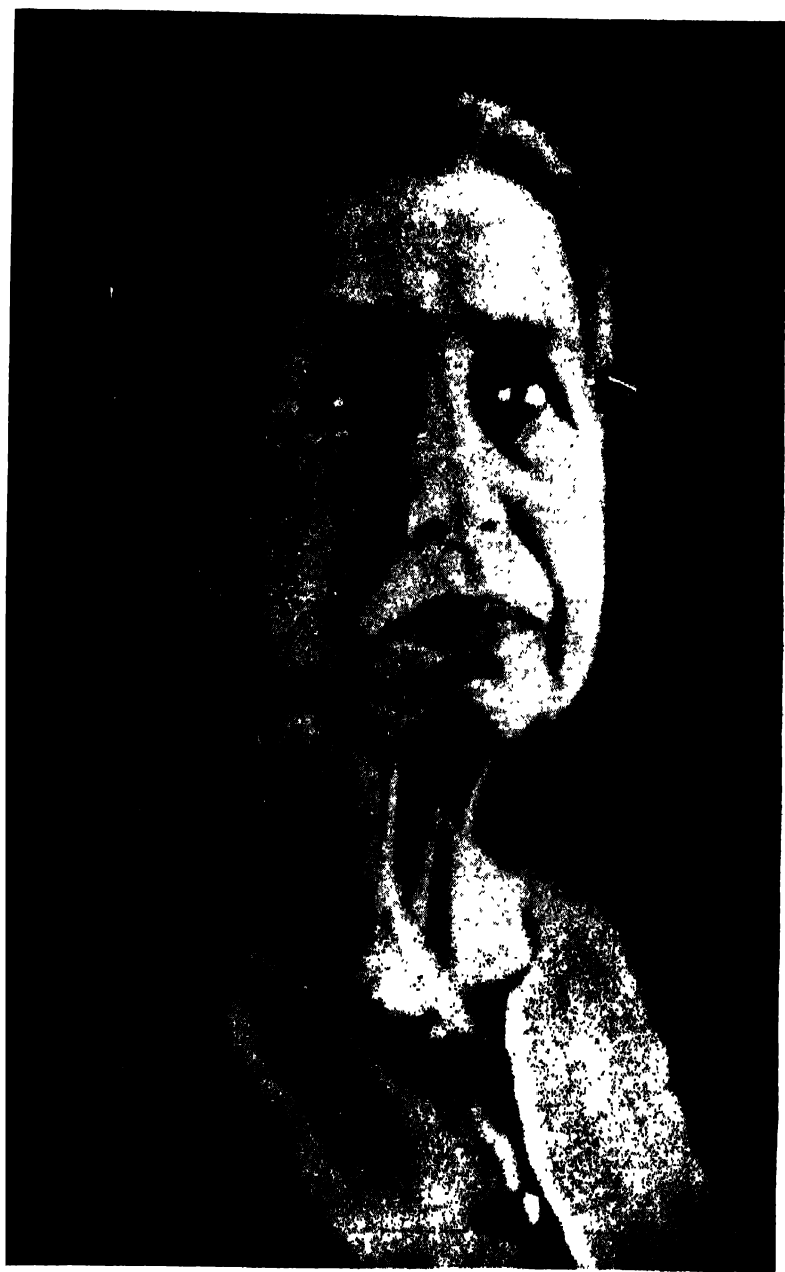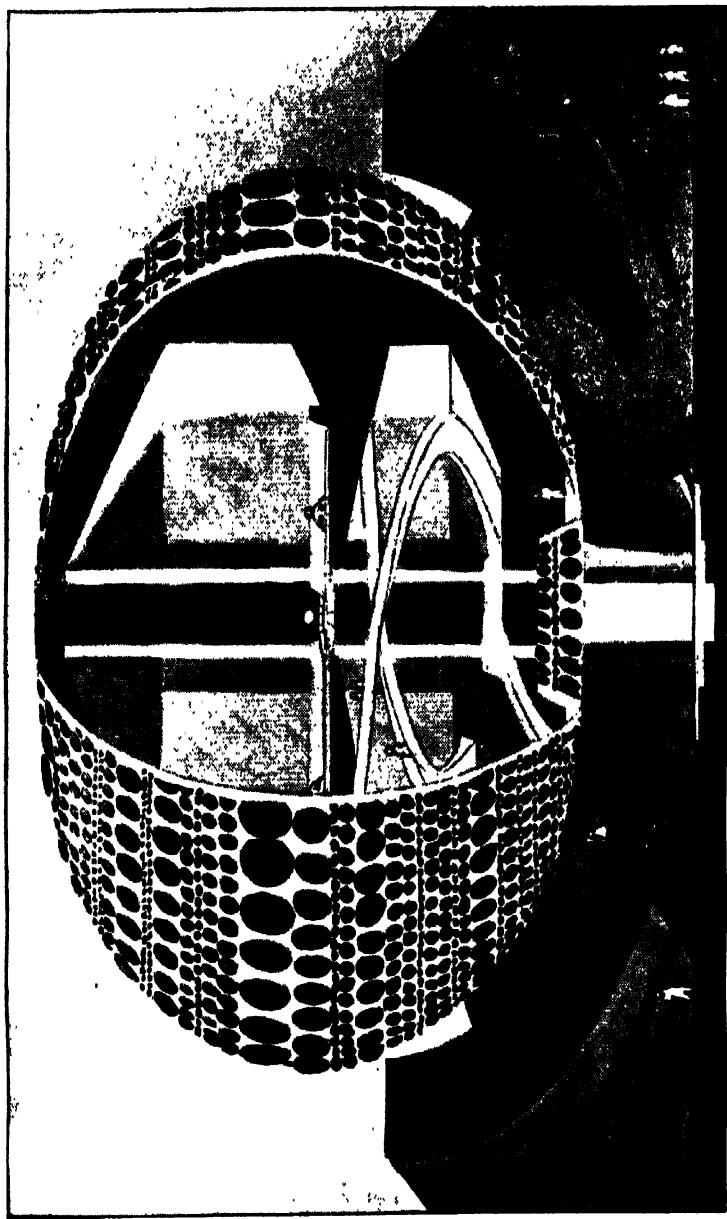
মায়ের অভিনব সৃষ্টি—বিশ্বনগরী অরোভিল

"হে সবিতৃবাণী, তুমি পৃথিবীর অন্তরাত্মাকে তুলে ধরবে আলোকের মধ্যে, ভগবানকে নামিয়ে আনবে মানুষের জীবনের মধ্যে, পৃথিবী হবে আমার কর্মশালা, আমার আপন গৃহ, আমার জীবন উদ্যান—দিব্যবীজ এক রোপনের জন্যে। মানুষী কালক্রমে তোমার কর্ম যখন শেষ হবে তখন পৃথিবীর মন হবে জ্যোতির আপন ভবন, পার্থিব জীবন হবে স্বর্গ অভিমুখে ক্রমবর্ধমান বৃক্ষ এক, পৃথিবীর দেহ হবে ভগবানের পুণ্য দেউল।"

—সাবিত্রী

শ্রীমায়ের নবতম বিস্ময়কর সৃষ্টি অরোভিল। সেই কোন সুদূর অতীতে ১৯১২ সনে মায়ের মানস নেত্রে ভেসে উঠেছিল এক মিলন ও শান্তি নগরী যেখানে পৃথিবীর সকল দেশের নরনারী তাদের জ্ঞান, বীর্য ও অভীপ্সা নিয়ে বিশ্বের স্বাধীন নাগরিক হয়ে বাস করতে পারবে—যেখানে থাকবে না অজ্ঞানতা—জয় করবে তারা অসামর্থ, অসত্য ও দুর্বলতা—সত্যকেই জীবনের ধ্রুবতারা করে তারা পৃথিবীর রূপান্তর সাধন করবে।

শ্রীমায়ের সেই সুদূর অতীতের স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত হতে আরম্ভ হয়েছে। শ্রীমা, শ্রীঅরবিন্দের নামে এই নগরীর নামকরণ করেছেন "অরোভিল"। এর আর এক অর্থও আছে—তা হচ্ছে ভোরের নগরী—নবজীবনের নগরী—ভবিষ্যতের নগরী। এর বাস্তব রূপ সম্পর্কে শ্রীমা বললেন—

"পৃথিবীর কোন এক জায়গায় এমন স্থান থাকতে হবে যেখানে সদিচ্ছা সম্পন্ন, আস্পৃহা পরায়ণ মানুষ স্বাধীনভাবে জগতের নাগরিক হিসাবে বাস করতে পারবে—তারা মানবে কেবলমাত্র একটি কর্তৃত্ব যা হচ্ছে পরমা সত্য—এ হবে শান্তি, সমন্বয় ও মিলনের স্থান—যেখানে মানুষের সকলপ্রকার সামরিক প্রবৃত্তি ব্যবহার হবে কেবল মাত্র দুঃখ ও

দরিদ্রতাকে, দুর্বলতা ও অজ্ঞানতাকে, সীমা ও অসামর্থতাকে জয় করার জন্যে ; এ হবে এমন এক স্থান যেখানে আত্মিক প্রয়োজন ও প্রগতির প্রতি লক্ষ্য স্থান পাবে—অভিলাষ ও আসক্তি, বাস্তব সুখ ও ভোগস্পৃহার উপরে। এই স্থানে শিশুরা বর্ধিত হবে আত্মার সঙ্গে সংযোগ রেখে—শিক্ষা দেওয়া হবে পরীক্ষা পাশের বা চাকুরী পাবার উদ্দেশ্যে নয়—তা দেওয়া হবে মানসিক শক্তি স্ফুরণের ও নূতন শক্তি যোজনার জন্যে। প্রত্যেকের যথাযথ দৈহিক পুষ্টি সাধনও হতে হবে। বুদ্ধিগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ—জীবনের সুখ ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হবে না, পরন্তু, তা ব্যবহৃত হবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে। সকল প্রকার শিল্প, অঙ্কন, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার সুযোগ ও সুবিধা সকলকেই দেওয়া হবে—সামাজিক বা আর্থিক সঙ্গতি তার মাপকাঠি হবে না। এই আদর্শ নগরীতে অর্থকে রাজত্ব করতে দেওয়া হবে না। ব্যষ্টিমূল্য স্থান পাবে সামাজিক মর্যাদা ও সমৃদ্ধির উপরে। এখানে কাজ করতে হবে জীবিকা নির্বাহের জন্যই নয়—কাজ এখানে করতে হবে নিজেকে প্রকাশের জন্যে, নিজের সামর্থ ও সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলবার জন্যে এবং সেই সঙ্গে সকলকে সেবা করার জন্যে এবং তারই প্রতিদানে সে পাবে কাজের ক্ষেত্র—অর্জন করবে তার জীবিকা। সংক্ষেপে এ হবে এমন এক স্থান যেখানে মানুষে মানুষে সম্পর্ক—দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগীতার ক্ষেত্র হতে পরিবর্তিত হয়ে সহযোগীতা, ভ্রাতৃত্ব ও কর্মদক্ষতায় রূপান্তরিত হবে।

এ এমন এক স্থান হবে যেখানে মানুষ ভবিষ্যতের দিকে ফিরে দাঁড়াবে। অরোভিল নির্মিত হচ্ছে তাদেরই জন্যে যারা জ্ঞান, শান্তি ও ঐক্যের ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাবান ও সেই দিকেই এগিয়ে চলতে চায়।"

শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দর্শনের রূপকার শ্রীমা এইভাবে এক নতুন পৃথিবী ও নতুন মানব সমাজ গড়ে তুলতে চান, যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাবে এক নতুন মানব চেতনা এবং সমষ্টিগত আদর্শ ও

প্রচেষ্টায় তা এগিয়ে যাবে মানব পরিপূর্ণতার দিকে। এই উদ্দেশ্য সাধনে মায়ের প্রথম পদক্ষেপ হ'ল শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম সংগঠন—পরবর্তী পদক্ষেপ, যা আরও বহির্মুখী—যার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত—যা সাধন করবে আত্মা এবং দেহ মন ও প্রাণের সমন্বয় এবং যা মানব সমাজের সমষ্টিগত জীবন গড়ে তুলতেও সহায়ক হবে—তা হ'ল অরোভিল রূপায়ণ বা এক কথায় যা হ'ল শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের পরিপূর্ণ রূপায়ণ।

শ্রীমা, অরোভিল পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির ওপর—যে সংস্থার শ্রীমা-ই চালক, সভাপতি। জাতি সঙ্ঘের শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (UNESCO) সাধারণ সভায় ভারত সরকার, শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির পক্ষ হতে, "অরোভিল" পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন

এই পরিকল্পনা অনুমোদন ক'রে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সদস্য রাষ্ট্র সমূহকে এই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে পরিষদ বলেন—"সদস্য রাষ্ট্র সমূহ ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে জানান হচ্ছে যে তাঁরা যেন আন্তর্জাতিক কৃষ্টি কেন্দ্র হিসাবে —"অরোভিল" গঠনে সাহায্য করেন—যেখানে পারস্পরিক সৌহার্দের পরিবেশে বিভিন্ন কৃষ্টির মূল্যায়ন ও সমন্বয় সাধন করা হবে এবং মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক প্রয়োজনানুসারে জীবনের পূর্ণ মান নির্ধারণ করা হবে।"

ইউনেসকোর ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল বললেন—"ইউনেসকো হ'তে আমরা অনুরূপ কল্পনার কথা ভেবেছি—চেষ্টা করেছি—সব দিক থেকে এগিয়েছি কিন্তু এখন আমরা এ বিষয়ে অরোভিলেরই মুখ চেয়ে আছি......"

বিভিন্ন রীতি, নীতি, মত ও পথের সমন্বয়ে অরোভিলে গড়ে উঠতে চলেছে এক বিশ্বজনীন সভ্যতা ও কৃষ্টি—যেখানে সর্বদেশের

স্ত্রী-পুরুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পরম শান্তিতে ও ক্রমবর্ধমান ঐক্যে বাস করতে পারবে। তারই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে রচিত হয়েছে অরোভিল সনদ।

অরোভিল সনদ

১। **অরোভিল**—কোন বিশেষ কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে—অরোভিল সামগ্রিক ভাবে সকল মানবের। অরোভিলবাসকারীকে দিব্য চেতনায় নিবেদিত প্রাণ সেবক হ'তে হবে।

২। **অরোভিল**— বিরামহীন শিক্ষার, সর্বকালীন প্রগতির এবং অক্ষুন্ন যৌবনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র হবে।

৩। **অরোভিল**—অতীত ও ভবিষ্যতের সংযোগ সেতু হবে। অন্তরের ও বাহিরের সকল আবিষ্কারের সুযোগ নিয়ে অরোভিল ভবিষ্যত উপলব্ধির পথে সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হবে।

৪। **অরোভিল**— প্রকৃত মানব ঐক্যের জন্য বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক গবেষণার জীবন্ত পীঠস্থান হবে।

১৯৬৮ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অরোভিলের বাস্তব রূপায়ণের প্রাক্কালে শ্রীমা বললেন—

"অরোভিল চায় বিশ্বের নগরী হতে ; যেখানে সকল দেশের নর-নারী বাস করবে শান্তি আর প্রগতির ঐক্যে—সকল ধর্মমত, সকল রাজনীতি, সকল জাতীয়তার উর্ধে। অরোভিলের উদ্দেশ্য মানব ঐক্য সাধন।"

এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনা হ'ল এদিন এক অভিনব অনুষ্ঠান সূচীর মাধ্যমে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ হতে এবং ভারতের সব রাজ্য হতে একটি কিশোর ও একটি কিশোরী এসে পৌছিল তাদের নিজের নিজের দেশের এক মুঠো মাটি নিয়ে—ঐদিন পুণ্যলগ্নে সুন্দর শুভ্র পরিবেশে প্রজ্বলন্ত শিখার ন্যায় অমিত তেজ ও বীর্য নিয়ে প্রতিটি কিশোর, প্রতিটি কিশোরী এক এক করে এগিয়ে এসে ঢেলে দিল মৃত্তিকা বহু নিম্নে পৃথিবীর গর্ভদেশে—অরোভিলের হৃদকেন্দ্রে মাধ্যে'ল

মোজাইকের শ্বেতশুভ্র পদ্মকোরকের উপরে—সমগ্র বিশ্ব মিলে মিশে এক হ'ল—সমস্ত বিশ্বের মৃত্তিকা বুকে ধারণ করে ঐ পদ্মকোরক হয়ে উঠল অরোভিলের শান্তি ও একতার মূর্ত প্রতীক—বিশ্বনগরী অরোভিলের ভিত্তি প্রস্তরের ভিত্তি হ'ল দৃঢ় স্থায়ী—সুদূর প্রসারী।

ভারতের অগ্নিতেজা প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর শ্রদ্ধাবাণী পাঠিয়ে বললেন—

"পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক আশ্রয় ও আত্ম-উপলব্ধির স্থান। পণ্ডিচেরী হতেই তাঁর দিব্য বাণী পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে। এইটি খুবই উল্লেখজনক কাজ হয়েছে যে পৃথিবীর নানা দেশের জ্ঞানপিপাসু মানুষ শ্রীঅরবিন্দের স্মরণে সেখানে এক নব নগরী স্থাপনা করছেন। বিভিন্ন কৃষ্টির সমন্বয় সাধনে ও আত্মিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সৃষ্টির কাজে পারস্পরিক সমঝোতার এ এক নিখুঁত পরিকল্পনা।

অরোভিল সত্যকারের জ্ঞান, প্রগতি ও শান্তি নগরীরূপে গড়ে উঠুক এই প্রার্থনা।"

বিশ্বনগরী নির্মাণের কাজ অদম্য বেগে এগিয়ে চলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে স্বেচ্ছায় শ্রম দান করতে এসে পৌঁছলেন স্থপতি, বাস্তুকার, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও আরও নানা স্তরের ও বিষয়ের পারদর্শী মানুষ—পুরুষ, নারী—সকলেই নবজীবনের পথের সন্ধানী—সবাই এসেছেন মায়ের অভিনব প্রচেষ্টার সেবক হয়ে এই জগতেই স্বর্গরাজ্য গঠনের প্রয়াসে। পনেরটি দেশের স্থপতি ও বাস্তুকার মিলে ফরাসী দেশের স্থপতি রোজার এ্যাঙ্গারের নেতৃত্বে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন অরোভিল রূপায়ণের কাজে।

অরোভিলের কেন্দ্রে থাকবে তিনটি জিনিস, কিন্তু সব কটিকে ধরে রাখা হবে একটি আকারের মধ্যে—যা হবে সৃষ্টির ঐক্যের প্রতীক। এই তিনটি হচ্ছে—মাতৃমন্দির, চিরঞ্জীব বটবৃক্ষ সমন্বিত ঐক্যের উদ্যান এবং শ্বেত প্রস্তরের পদ্মকোরকের আধার—যা পৃথিবীর সর্বদেশের এক-

এক মুঠো মাটি বক্ষে ধরে হয়েছে সর্বজয়ী।

অরোভিলের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে মাতৃ-মন্দির, যা অরোভিলের শক্তিরও কেন্দ্র। মাতৃমন্দির অরোভিলের চেতনাকে ধরে থাকবে—এ হবে প্রত্যেক অরোভিলবাসীর অন্তরের তীর্থক্ষেত্র—নিজ নিজ আত্মার সন্ধান মিলবে এখানে। যারা অরোভিলের নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে চাইবে—এ হবে তাদের সমবেত জীবনের সৌন্দর্য ও সমন্বয়ের প্রতীক।

মাতৃমন্দিরের স্থাপত্য পরিকল্পনা তার উদ্দেশ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে—এ বোধে আনবে পৃথিবীর গর্ভ হতে চেতনার স্বর্ণরশ্মির উৎসরণ কিভাবে ঘটে। মাতৃমন্দিরের বর্হিগাত্রের স্বর্ণগোলক সমূহের বিচ্ছুরিত প্রকাশমান জ্যোতির ন্যায় এ প্রকাশ করবে বহু বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে সদা চলায়মান মানুষের জীবনকথা ও তার কর্মধারা।

কিন্তু মাতৃমন্দিরের বাহিরের গঠনের ভিতরে মাতৃমন্দিরের মর্মবাণী জানা যাবে না—মর্মবাণী জানতে হবে এর অন্তর্দেশে। এর অন্তর্জীবনে প্রবেশের জন্য রয়েছে আলাদা পথ। সেই পথ তোমাকে পৌঁছে দেবে গোলকের অন্তর্দেশের নিম্নভাগে—একেবারে নিম্নে গভীরে—গর্ভস্থানের সন্নিকটে—সেখান হতে ধীর পদক্ষেপে তোমাকে এক খাড়া ঋজু বর্ত বেয়ে ধাপে ধাপে উঠতে হবে আলোকের উৎসে—উর্ধপানে—ঐ পথ পরিক্রমায় উঠে এসে পৌঁছিবে এক সুড়ঙ্গ পথে—তার ভিতরের পথ বেয়ে উঠবে উর্ধদেশে—অন্ধকার পার করে সেই পথ তোমাকে পৌঁছে দেবে উপরের স্তরে স্থিত ধ্যান চত্বরে—ধ্যান চত্বর আবার চার ভাগে বিভক্ত—যেমন মাতৃ মন্দিরে প্রবেশের চারিটি পথ। প্রত্যেকটি চত্বর উজ্বল আলোকে আলোকিত—কৃত্রিম আলোকে নয়, সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। মাতৃমন্দির শীর্ষের উন্মুক্ত স্থান হতে যান্ত্রিক উপায়ে পুঞ্জীভূত সূর্যকিরণকে ধরা হবে একটি গোলকে—এবং যা সেই প্রজ্বলন্ত গোলক হতে প্রতিফলিত হয়ে আলোকিত করবে প্রতিটি চত্বর।

তীর্থ অভিলাষী মানুষ এই আলোক স্নানে সঞ্জীবিত হয়ে প্রতিদিন

মাতৃমন্দিরের ধ্যানে তার নিজের অন্তরের আলোকের সন্ধানে এগিয়ে চলবে। এই আলোক স্নান তাকে শক্তি যোগাবে—সমর্থ করে তুলবে পার্থিব কাজে—মানব ঐক্যের সাধনায়—প্রস্তুত করে তুলবে তাকে সত্যকার সত্তার অনুসন্ধানে।

মায়ের কল্পনায় মাতৃমন্দির হবে এক সত্যের নিলয়—হ্রদে ঘিরে থাকবে মন্দিরটি—আবার ঐ হ্রদকে বেষ্টন করে থাকবে ঐক্যের উদ্যান। ঐক্যের উদ্যানের মধ্যস্থলে থাকবে চিরঞ্জীব বট। আকার ও অবস্থানের দিক থেকে মাতৃমন্দির হবে নগরীর হৃদকেন্দ্র। এখান হতে বাস্তব ও আধ্যাত্মিক আলোকের ও জ্যোতির বিকিরণ হবে অরোভিলের সর্বত্র।

হ্রদের বাহিরে বৃত্তাকারে থাকবে অরোভিলের চারিটি মণ্ডল। উত্তরে শ্রমমণ্ডল—এখানে থাকবে আদর্শ ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা, কুটিরশিল্প, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর প্রভৃতি। দক্ষিণে আবাস-মণ্ডল—বাগান, ফোয়ারা, হ্রদের মাঝে ছোট বড় সুন্দর বাড়ীগুলি ছবির মত সাজান হবে—সেই সঙ্গে স্থানে স্থানে থাকবে দোকান, বাজার, হাসপাতাল, স্কুল প্রভৃতি। পশ্চিমে আন্তর্জাতিক মণ্ডল—নিজের নিজের কৃষ্টি কলা সংস্কৃতি নিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্যাভিলিয়ন বা মণ্ডপ থাকবে এখানে, যাতে করে দেশ বিদেশের মানুষ পরস্পরকে জানতে ও বুঝতে পারবে—পরস্পরের কৃষ্টির, সংস্কৃতির আদান প্রদান করতে পারবে। পূর্বে থাকবে সাংস্কৃতিক মণ্ডল—এখানে স্থাপিত হবে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়—আন্তর্জাতিক খেলা-ধূলা ও শরীর চর্চার স্থান—সব রকমের পরিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা—সর্বাধুনিক অলিম্পিক ষ্টেডিয়াম, অশ্বারোহণ, গ্লাইডিং প্রভৃতি শেখার সব রকম সুবন্দোবস্ত।

অরোভিলের বহিঃ সীমানায় থাকবে শান্তি সমৃদ্ধ সবুজে ঘেরা ভারতের আদর্শ পল্লীগ্রাম—যেখানে বাস করবে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা বিশ হাজার সুখী আত্ম-প্রত্যয়ী নরনারী।

অরোভিলের স্থায়ী অধিবাসী হবে পঞ্চাশ হাজার—যারা মানব

ঐক্যের মূল সত্যে হবে দৃঢ় বিশ্বাসী, আর সেই ঐক্য বাস্তবে রূপায়িত করতে তারা হবে স্থির প্রতিজ্ঞ।

১৯৭২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী মায়ের শুভ-জন্মদিনে মাতৃমন্দিরের শুভ নির্ম্মাণারম্ভের উৎসব—তখনও ভোরের আলো ফোটে নি—সেই আধফোটা আলো আঁধারের প্রত্যুষে স্নিগ্ধ সমীরণে একে একে, দলে দলে সমবেত হতে থাকেন সকলে অরোভিল প্রান্তরে এই শুভ উৎসবে অংশ গ্রহণের জন্যে—এই অক্ষয় মাতৃমন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ অন্তরে পরমের ভিত্তি স্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্য বুকে নিয়ে।

মাতৃমন্দিরের ভূপৃষ্ঠের ব্যাসের দৈর্ঘ হ'ল আশি ফুট। ভূপৃষ্ঠ হতে মাতৃমন্দিরের গর্ভ খাড়া নেমে গেছে কুড়ি ফুট—সেই কুড়ি ফুট নীচে, পনের কুড়ি ফুট প্রশস্ত একটি সমতল ধাপের সৃষ্টি হয়েছে—সেখান হতে গর্ভ আবার খাড়া নেমে গেছে তলদেশ পর্যন্ত। তলদেশে ষড়ভুজ এক মৃত্তিকা বেদীর উপরে ফুলসজ্জায় এঁকে দেওয়া হয়েছে শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের প্রতীক—আর সেই প্রতীকের কেন্দ্রে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত রয়েছে—আস্পৃহার অগ্নি—অনুভূতির অগ্নি—উপলব্ধির অগ্নি। উৎসবে সমবেত সকলে বৃত্তাকারে সমতলে দাঁড়িয়ে এক একটি প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করে মাতৃমন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কাজ সুসম্পন্ন করলেন একে একে। মায়ের কণ্ঠে মাইক্রোফোনে তখন ধ্বনিত হচ্ছে—"ভগবদ মুহূর্তের বাণী"—সুরের মূর্ছনায়, দিব্য স্পন্দনে মাতৃমন্দিরের গর্ভ মন্দির তখন বিপুল স্পন্দনে স্পন্দিত। এই ভাব গম্ভীর স্বর্গীয় পরিবেশে নলিনীকান্ত পড়লেন মায়ের বাণী—

> **"অরোভিল হ'তে চায় প্রগতিশীল ঐক্যের প্রতীক, আর তা রূপায়িত করার শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল কর্মে ও অনুভবে দিব্য পূর্ণতার দিকে মিলিত আস্পৃহায় সমগ্র জীবন পাত্রটি উৎসর্গ করা"।**

মায়ের বাণী ধ্বনিত হ'ল—

"মাতৃমন্দির—ভগবানের প্রতি অরোভিলের আস্পৃহার জীবন্ত প্রতীক হোক;

মাতৃমন্দির—মানবের পরিপূর্ণতার আস্পৃহার উত্তরে ভগবদ ইচ্ছার প্রতীক হোক;

প্রগতিশীল মানব ঐক্যে নিজেকে প্রকাশ ক'রে মানুষ এখানে ভগবানের সঙ্গে এক হোক।"

শ্রীমায়ের কণ্ঠ আবার শোনা গেল—

"অরোভিল সকল প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ঊর্ধে উঠে একমাত্র সত্যের সেবা করবে।

অরোভিল হবে বিশ্বস্ততা, সত্য ও শান্তির প্রতি অভিযান॥"

১৪

মায়ের স্বরূপ

"মা এক অতিমানস মহাশক্তি, দিব্য এক সর্বজ্ঞানময় ইচ্ছা, আর সর্বক্ষমতাময় জ্ঞানের আধার ; সে শক্তি আপন অভ্রান্ত ক্রিয়ায় নিত্য প্রকট, সকল গতিধারা মায়ের পদক্ষেপ,···তিনি সেই শক্তিময়ী জ্ঞানময়ী যিনি আমাদেরকে উন্মুক্ত করে ধরেন অতিমানস আনন্ত সকলের দিকে, বিশ্বব্যাপী বিশালতার দিকে, পরম জ্যোতিঃ মহৈশ্বর্যের দিকে, আলৌকিক জ্ঞানভাণ্ডারের দিকে।"

—শ্রীঅরবিন্দ

মা স্বয়ং ভগবতী—দিব্য তাঁর শক্তি, তিনি অনন্তরূপিনী। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—তিনি সেই স্বর্ণ সেতু—মা মানুষের মন ও ভগবানের মধ্যের বিরাট ব্যবধানের সেতু বন্ধন করে এক দিব্য রশ্মি-রূপে মধ্যস্থলে এসে পৃথিবীকে স্পর্শ করেছেন···মহাজননী এই প্রাকৃত জগতকে দিব্যভাবে রূপান্তরিত করার জন্যে পার্থিব দেহ ধারণ করেছেন···মননশীল মানবের মধ্যে এক নতুন দিব্য আবির্ভাব দেখা দিয়েছে। এই সবই শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন তাঁর সাবিত্রী মহাকাব্যে —আমরা জানি এই শক্তি, এই গুণ, এই মহান প্রচেষ্টা পরিদৃষ্ট হয়েছে শ্রীমায়ের মধ্যে—এবং তাঁকেই লক্ষ করে শ্রীঅরবিন্দের অনবদ্য কাব্য, "সাবিত্রী" রচিত হয়েছে।

এক এক জনের নিকট মা এক এক ভাবে প্রতিভাত হয়েছেন। সাধারণ ভক্ত শিষ্য থেকে আরম্ভ করে জ্ঞানী, গুণী, সাধক, সর্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত পর্যন্ত দেখেছেন মায়ের অনন্তরূপরাজি। কেউ দেখেছেন ধ্যান দৃষ্টিতে, কেউ দেখেছেন স্বপ্নে, কেউ তপস্যার আলোকে, আবার কেউ বা পার্থিব দৃষ্টিতে। যে যে ভাবেই দেখুন না কেন—সকলেই মায়ের অন্তরালে অবস্থিত তাঁর ভগবত্তাকে অনুভব করেছেন —যাঁরা তাঁর স্পন্দন রশ্মির কিছুটা নিকটে পৌছেছেন তাঁরা তাঁর শক্তি ও আলোকের অনুভূতি নিয়েই ফিরেছেন।

এই রূপরাজির কথায় শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"মায়ের শুধু একরূপ নয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন তিনি। জড় দেহের পশ্চাতে মায়ের বহু আকৃতি, শক্তি ও ব্যক্তিত্ব আছে।" তিনি আরও বলেছেন—"সাধারণ মানুষকে শেখানর জন্যে, পথ পরিক্রমার জন্যে ভগবতী মা মানুষের আকার ধারণ করেন ও মানুষের স্বভাব-যুক্ত হয়ে আসেন—কিন্তু তাতে করে তাঁর দেবত্ব যায় না। এই ভাবেই আবির্ভাব হয়—এই আবিভাব বর্ধিত ভগবদ চেতনার প্রকাশ সূচনা করে—এ মানব সত্তার ভগবদ সত্তায় পরিণত হওয়া নয়। এমনকি শৈশবেই মা অন্তরে মানব চেতনার উর্ধে অধিষ্ঠিত ছিলেন।"

"মা এসেছেন অতিমানসকে নামিয়ে আনার জন্যে এবং এই অবতরণই মায়ের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব করেছে। তাঁর দেহ ধারণে পার্থিব চেতনায় অতিমানস শক্তির অবতরণ এবং প্রয়োজনীয় রূপান্তর সম্ভব হয়েছে···।"

"একই ভগবতী শক্তি বিশ্বে, বিশ্বাতীতে, ব্যষ্টিতে ও সমষ্টিতে কাজ করে চলেছে। মা-ই এ সকল করছেন—মা, দেহ আশ্রয় করে, এখানে এই জড় জগতে প্রকাশ হয়নি এমন কিছু নামিয়ে আনার জন্যে কাজ করে চলেছেন—যাতে করে এখানেই জীবনের রূপান্তর ঘটে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি কাজ করছেন—এই জন্যই তুমি তাঁকে ভগবতী শক্তি বলে মানবে। তিনি দেহতে তাই-ই, কিন্তু তাঁর সমগ্র চৈতন্যে তিনি ভগবতী মায়ের অপর সকল বিভাবের সহিত একীভূত হয়ে আছেন।"

ভগবতী-মা হচ্ছেন ভগবানের শক্তি ও চৈতন্য—যা সকল বস্তুরই মা। মা নিজে বলছেন "জগতের সৃষ্টির আদি হতে যেখানেই এবং যখনই চৈতন্যের এতটুকু রশ্মির প্রকাশ সম্ভব হয়েছে—জানবে যে সেখানেই আমি আছি।"

মায়ের নানা ঐশ্বর্য ও শক্তি—দুর্গা শক্তিরূপে মা রক্ষা করেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"মায়ের রক্ষাকারী শক্তির নাম দুর্গা—যিনি

সকল দুর্গতি ও দুর্গমতার ভিতর দিয়ে আমাদের পার করে দেন।... মায়ের এই শক্তি আমাদের পক্ষে বিশেষ সাহায্যকারী। এর সাহায্য ছাড়া আমরা কোন কিছু বড় কাজ নিজেরা করতে পারি না। সাহায্য পাওয়ার জন্য নিজেকে সব সময় এর দিকে খুলে ধরতে হবে...তা যদি পার তাহলে মা সব সময়ই তোমার সঙ্গে থাকবেন।"

আরোগ্যশক্তিও মায়ের এক বিশেষ শক্তি। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"মায়ের শরণ নিলে তাঁর রক্ষাকারী শক্তি তোমাকে সকল বিপদ হতে পার করিয়ে দেবে।"

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'মা' বইতে জগন্মাতার চারিটি বিভাবের পরিচয় দিয়েছেন—বিভিন্ন প্রকাশ অনুসারে তিনি কোথাও বা মহেশ্বরী, কোথাও মহাকালী, কোথাও মহালক্ষ্মী, আবার কোথাও বা মহাসরস্বতী। মহেশ্বরী হলেন জ্ঞান ও করুণা স্বরূপা; মহাকালী হলেন বল ও বীর্য স্বরূপা; মহালক্ষ্মী হলেন শ্রী ও সৌন্দর্য স্বরূপা; আর মহাসরস্বতী হলেন শৃঙ্খলা ও পূর্ণ সিদ্ধি স্বরূপা।

'মা' বইতে শ্রীঅরবিন্দ আমাদের এই মায়েরই কথা বলেছেন কিনা এই সন্দেহ নিরসনের জন্য একজন প্রশ্ন করেছিলেন—"আপনি কি এই মাকেই আপনার বই 'মা' (The mother)-তে উল্লেখ করেছেন" ? উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বললেন—"হাঁ"। মা যে ভগবতী মা সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ এইভাবে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে সকল সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছেন।

১৯২৮ সনে দক্ষিণ-ভারতের প্রখ্যাত-নামা সর্বশাস্ত্র পারঙ্গম পরম সাধক কাব্যকণ্ঠ গণপতি শাস্ত্রী শ্রীমায়ের সঙ্গে ধ্যানে ব'সে মায়ের শাকম্বরী রূপ দর্শন করেন।

অপর একজন বিশিষ্ট সাধক ও জ্ঞান তপস্বী শ্রীকপালী শাস্ত্রী মাকে দর্শন করে, মায়ের শক্তির পরম অনুভূতি পেয়ে লিখলেন—

"মা স্বয়ং পরম্ বিস্ময়। একবার যদি তাঁর শক্তি গ্রহণ উন্মুখী হ'য়ে

নিজেকে ছেড়ে দাও, তিনি তোমার মধ্যে সঞ্চারিত করবেন প্রাচুর্যের প্লাবন।

কি অপূর্ব, সুদুর্লভ যুগে জীবনধারণ করছি!

মা! তিনি বিস্ময়ের চেয়েও পরম বিস্ময়। সচেতন ভাগবতী শক্তি, গ্রহণ করেছেন মানুষী তনু ও ব্যক্তিত্ব।

শ্রীমা পরমা শক্তির জাগ্রত প্রতীক।

সমগ্র বিশ্বের অখণ্ড শক্তি তাঁর মধ্যে বিরাজমান।..... যে শক্তি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছে, যে জ্যোতিঃ সকল জ্ঞানের উৎস, সর্ব বস্তুর আত্মা এবং আনন্দ, সর্ব বস্তুর সার—তিনিই শ্রীমা!

আমার কাছে শ্রীমা এক শ্বেত জ্যোতিঃ শিখা;"

পণ্ডিচেরী আশ্রমের শাস্ত্রজ্ঞ সাধক শ্রীমাধব পণ্ডিত লিখেছেন—"যিনি নিজের মধ্যে, অন্য সকল জ্যোতিঃ শক্তি বা বিভূতির সহিত, শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ সফল করিয়া তুলিবার যোগশক্তি ধারণ করিয়া আছেন, সেই শ্রীমার পবিত্র নাম গ্রহণ করা অপেক্ষা আর কি স্বাভাবিক ব্যাপার হইতে পারে?

আমার হৃদয়ের গভীরতম তন্ত্রীতে যে নাম ধ্বনিত হইয়া উঠে তাহাই আমার মন্ত্র। হৃদয় ও আত্ম-বিমোহনকর তাঁহার রূপ দেখিবার সময় আমার সত্তার মধ্যে যে নাম উদ্গত বা উত্থিত হয় তাহাই আমার মন্ত্র।...এই মন্ত্রে শক্তি সঞ্চারের প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে এই মা-মন্ত্র আমার মধ্যে প্রাণের ধারা প্রবাহিত করে। প্রতিবার মা নাম উচ্চারণের সঙ্গে তিনি নিজে যে প্রেমের সমুদ্র, তথা হইতে একটি তরঙ্গ আসিয়া আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, ভিতর হইতে আমাকে পরিপ্লাবিত করে, হৃদয় প্রেমাশ্রু বর্ষণ করে। আমি নয়নাশ্রুকে বিশ্বাস করি না—কেন না তা প্রতারিত করিতে পারে—কিন্তু আমি নিজেকে হৃদয়স্থ এই মধুময় তরঙ্গের নিকট সমর্পণ করি।"

শ্রীঅরবিন্দের অনুজ শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ লিখছেন—"যে কেউ শ্রীঅরবিন্দের যোগের আধ্যাত্মিক শক্তির স্পর্শ মাত্র পেয়েছে, সে নিশ্চয়

করে জানে যে এই পূর্ণ যোগের চাবিকাঠি রয়েছে মায়েরই হাতে। শ্রীঅরবিন্দ একবার নিজেই আমাকে বলেছিলেন যে এত বেশী যোগশক্তি সম্পন্ন আর কেউ অতীতে কখনও জন্মেছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি আরও বলেছিলেন তাঁর নিজের দশ বছরের যোগ সাধনাতে যে কাজ হ'তো মায়ের সংস্পর্শ পেয়ে এক বছরেই সে কাজ হ'য়ে গেছে।"

"শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম জীবন কথা" বইতে মায়ের শক্তি সম্বন্ধে একটি সুন্দর ঘটনার কথা বিবৃত হয়েছে, তার কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল—

"অধ্যাত্ম জগতের একজন দিকপাল, তিরানব্বুই বৎসর বয়স্ক বিশিষ্ট সাধক ও শাস্ত্রকার বেদমূর্তি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ দামোদর সৎবলেকার, সাহিত্য বাচস্পতি, গীতালঙ্কার—ইংরাজীতে গীতার বিরাট ভাষ্য রচনা করেছেন এবং বেদের ৩০ খণ্ড ভাষ্য লিখেছেন। সারা জীবনই তিনি অতিবাহিত করেছেন বেদ অধ্যয়নে। ১৯৬০ সনের জুলাই মাসের শেষ দিক হতে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত আশ্রমের মান্য অতিথিরূপে তিনি এখানে অবস্থান করেন।

আশ্রমে আসার পরদিনই তাঁর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। সাক্ষাৎকার হয় নীরবে—মায়ের সঙ্গে ধ্যানে বসেও বাক্যালাপ হয়নি। ধ্যানের পরে তাঁর অনুভূতি জানিয়ে তিনি বললেন—"মায়ের সঙ্গে ধ্যানে বসে আমি আমার হৃদয়ের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের সাতটি দুয়ার খুলে যেতে দেখলাম, আর শুভ্র আলোক মণ্ডিত আপন আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করলাম।"

তিনি আরও বললেন—"মায়ের শক্তি সর্বত্রই কাজ করছে—যে জিনিসের জন্য আমি পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে প্রার্থনা করে এসেছি, যা আমার জীবনের চিরদিনের স্বপ্ন ছিল, তাই আমি এখানে এসে জীবন্ত প্রত্যক্ষ করলাম। বোধ করি বৈদিক যুগের পরে এই প্রথম এরূপ ধরণের প্রচেষ্টা সম্ভব হয়েছে। এখানকার সমগ্র সাধন পদ্ধতি বৈদিক

আদর্শের অনুগামী। বেদে যার ইঙ্গিত মাত্র করা হয়েছে সেই জিনিসই এখানে একভাবে বা অন্যভাবে সার্থক করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, তাই দেখে আমার হৃদয় আনন্দে ভরে উঠেছে।"

আশ্রমের একটি বিভাগের নাম মা প্রস্‌পারিটি, অর্থাৎ প্রাচুর্য রেখেছেন, যেখান হতে আশ্রমবাসীদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়া হয় এই কথা শুনে দামোদর সৎবলেকার মহোদয় বললেন—"এই তো এখানে আধ্যাত্মিকতা যথার্থভাবে রূপায়িত হয়েছে। বেদে কোথাও সন্ন্যাস রীতির উল্লেখ নাই। তাতে সর্বত্রই দেখি সম্পদ লাভের জন্য, তেজস ও ওজসের জন্য, এমন কি পার্থিব জিনিসের জন্যও প্রার্থনা। কোথাও দেখি না দারিদ্রের বর্ণনা, নিঃস্ব হয়ে গাছতলায় বসে প্রয়োজনীয় সব কিছু বর্জন করে থাকার কথা কোথাও নেই। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে কোথাও গিয়ে নিশ্চল হয়ে পরমাত্মার ধ্যানে বসে থাকা—এ জিনিস বৈদিক জীবন ধারার মধ্যে একেবারেই নেই। বৈদিক যুগে জনকের মত রাজা রাজত্ব করতেন ; বশিষ্টের মত ঋষিরা রাজাদের পিছনে থেকে সমুচিত মন্ত্রণা দান করতেন। ঋষিরা সংসার ত্যাগ করে বনে বাস করতেন না—সেটা এ'ল ভারতের অন্ধকার যুগে। মাকে দেখেছি বিত্তের দিকেই জোর দিতে—উগ্র বিত্তহীনতার দিকে নয়। তিনি মানুষের জগতকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে চান না, তিনি চান আধ্যাত্মিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এর প্রাচুর্য, তিনি চান জগতকে বদলে দিতে। এখানে দেখা যাচ্ছে বৈদিক যুগেরই এক পুনর্জন্ম। বাস্তবের কোন কিছু এখানে বর্জিত হবে না, সবই যথা স্থানে তার স্থান পাবে।"

সত্যিই আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের এমন এক সন্ধিক্ষণে জন্মেছি যখন ভগবতী মা নিজে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন—পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারিত করছেন এবং যে সময় পৃথিবীতে মনের যুগ পার হয়ে অতিমানসের যুগে উত্তরণ আরম্ভ হয়েছে।

মায়ের সাধন ইতিহাসও অনন্ত—মানব কল্পনা সেখানে পৌঁছিতে

পারে না। জন্ম হতেই মায়ের সাধনার আরম্ভ—সাধনা সঙ্গে নিয়েই মা এসেছেন আমাদের পথ দেখাতে—কিভাবে সাধনা করতে হয়, কি ভাবে ভগবানের নিকট সবকিছু সমর্পণ করে তাঁকে ডাকতে হয়—কি ভাবে মন প্রাণ সব ঢেলে তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে হয়—কি ভাবে সংসার জীবনে থেকেও ভগবদ জীবন, দিব্যজীবন যাপন করা যায়—এই সব দেখাতে, নিজে করে দেখিয়ে অপরকে তার আদর্শ গ্রহণ করাতে মা এসেছেন—সেই জন্যই আমরা দেখতে পাই তাঁর সেই কোন ছোটবেলা - মাত্র চার বছর বয়স হতেই আরম্ভ হয়েছে তাঁর সাধন সমাধি—যদিও ধ্যান কি বস্তু তা তাঁর বোধে তখন ছিল না—আরও একটু বড় বয়সে রাত্রির পর রাত্রি স্বপ্নের ভিতর দিয়ে তাঁর চেতনা দেহের স্তর, প্রাণের স্তর, মনের স্তরের উর্ধে উঠে প্রজ্ঞা মন, বোধি মন পার হয়ে প্রাক-জ্যোতিঃ স্তরে (Subliminal) বা অধিমানসের স্তরে উঠে যেত—পরমের স্পর্শ লাভ করত—ধ্যানের মাঝে প্রার্থনার আকারে আকরিত হ'ত তাঁর আকুতি ভগবদ সত্যের জন্য। তারপরে মা তাঁর যৌবনে অধ্যাত্ম চেতনা নিয়ে গড়ে তুলেছেন ভগবদ অন্বেষীর দল পারী সহরে—এক প্রবল আস্পৃহা নিয়ে পৃথিবীর নানা দেশে পথের সন্ধানে ফিরেছেন তিনি—আলজিরিয়াতে এসে অতীন্দ্রিয় বিদ্যার সত্যে উপনীত হয়েছেন—পরে ভারতের যোগসূত্র, বেদান্ত, তন্ত্র প্রভৃতি অধিগত করেছেন—সবই করেছেন সেই এক উদ্দেশ্যে—অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের পরম সত্যে পৌঁছিবার জন্যে—অবশেষে পথের দিশা, আলোকের সন্ধান মা পেয়েছেন ভারতে এসে শ্রীঅরবিন্দের পূত সান্নিধ্যে। শ্রীঅরবিন্দের ভিতরে তিনি দেখলেন এক বিরাট পুরুষ—এক পূর্ণ সমর্পিত প্রাণ আত্মা, রয়েছে প্রচণ্ড শক্তির আধার হয়ে। শ্রীঅরবিন্দকে দেখা মাত্রই মায়ের সকল মানসিক ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। শ্রীঅরবিন্দের নির্বাণ এসেছিল ১৯০৮ সনে, মায়ের তা এল তার ছয় বছর পরে ১৯১৪ সনে—ঠিক একই বয়সে। শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন মাত্রই নীরবতার ভিতরে মায়ের মধ্যে নেমে এল এক পরম

সত্য—মায়ের পথ এখন পরিষ্কার—পূর্বের শিক্ষা, দীক্ষা, অনুভূতি, উপলব্ধি সব লুপ্ত হয়ে গেল—যেন কোনদিন কিছুই তিনি শেখেন নি, জানেন নি, দেখেন নি—তিনি তাঁর সকল সাধনা, সকল উপলব্ধি শ্রীঅরবিন্দকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেন—পূর্ণ নীরবতার ভিতরে আকুল আস্পৃহা নিয়ে চেতনার নব উন্মেষের জন্য অপেক্ষায় রইলেন। প্রথম পর্যায়ে শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে প্রায় এক বৎসর তাঁর সাধনার ধারা অনুধাবন করেছেন -শ্রীঅরবিন্দেকেই তাঁর গুরু, ইষ্ট, প্রভু বলে বরণ করেছেন—নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করেছেন তাঁরই পায়ে। কিন্তু এই সব হতে বিযুক্ত হয়ে মায়ের আরও অখণ্ড সাধনার প্রয়োজন ছিল—তাঁকেইতো বহন করতে হবে মানব কল্যাণের গুরু দায়িত্বভার—পরম সত্যকে নামিয়ে আনতে হবে জগতের বুকে—মানুষের জীবনকে পরিণত করতে হবে দেবজীবনে—তাদের পথ প্রদর্শক হ'তে হবে। মনে হয় শ্রীঅরবিন্দ সব তথ্যই জানতেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে, তাই শ্রীমায়ের গুরুর সান্নিধ্য—ইষ্টের সান্নিধ্য ত্যাগ যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন, শ্রীঅরবিন্দ সস্মিত মুখে, স্মিত হাস্যে তা অনুমোদন করে বলেছিলেন—"বেশ"। কিন্তু ব্যথায় মায়ের প্রাণ ভরে গেল—দুঃখের পশরা মাথায় নিয়ে মা শ্রীঅরবিন্দ সান্নিধ্য ত্যাগ করে চললেন—প্রবল অভিমানে মা তখন ব্যথিত, ক্ষুব্ধ—শ্রীঅরবিন্দ, তাঁর আর্য পত্রিকার কাজের অত্যাবশ্যকতা অনুধাবন করলেন না—তাঁর কাজের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেন না—গভীর দুঃখে তিনি ফিরে চললেন। তাঁর পরমের প্রতি প্রার্থনায় আকুল হয়ে মা বললেন—"জীবনে আর কোন দিনই এই আবেষ্টনে আমাকে বাস করতে হয় নি—মনে হ'ল এক মর্মন্তুদ নিঃশব্দতার, আধ্যাত্মিক দৈন্যের হাওয়া আমার ভিতর বয়ে যাচ্ছে—অথচ মন তা এড়িয়ে যেতে চাইছে না—অনুভব করছি তারও ভিতরে আছে অসীম মাধুর্য যাতে মিশে আছে দুঃখ আর আনন্দ একই সঙ্গে—আর তাতে রয়েছে ভবিষ্যতের বীজ।" মা এই সকলের ভিতরেই ডুবে গেলেন এক নিরন্তর গভীরতম সাধনায়। নির্জন বাসে পরম চেতনার

অনন্ত বৈচিত্র নিয়ে মা উঠে গেলেন বিশ্বচেতনায়—তারও উর্ধে উঠলেন বিশ্বাতীতের পানে তীব্র আস্পৃহা নিয়ে, পূর্ণ সমর্পণ নিয়ে—মায়ের ভিতরে নেমে এল এক মহাশক্তি, তবুও মা আকুতি করে তাঁর মধুর ভগবানকে বলছেন—"ভগবান! শেষ বাধা ভেঙ্গে ফেল—শেষ অশুদ্ধি সব নিঃশেষে পুড়িয়ে দাও, বজ্র হান যদি তাতে এই আধার রূপান্তরিত হয়ে ওঠে।"

আবার মা কয়েকমাস ধরেই গভীর ধ্যান সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে গেলেন—মায়ের এখন অবস্থান্তরের সময়—এক স্থিতি হতে আর এক পূর্ণতর স্থিতিতে উত্তরণ—মায়ের সামনের সব বাধা, পরদা, খসে পড়্‌ল—সমস্ত সত্তা দুলে উঠ্‌ল, ভরে গেল পূর্ণ জ্যোতিঃতে, দিব্য চেতনায় মা সমৃদ্ধ হলেন।

তখন মায়ের মধুর ভগবান মাকে ডেকে বলছেন—"তুমি ফিরে যাও পৃথিবীর দিকে—সেখানে তোমাকে তৈরী থাকতে হবে—তোমাকে প্রয়াসের, বিপদের, অপ্রত্যাশিতের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে—এই ব্রতের জন্যই তুমি তৈরী হয়েছ—পৃথিবীর দিকে, মানুষের দিকে তুমি ফিরে দাঁড়াও।"

উত্তরে মা বললেন—"ভগবান আমি তৈরী।" মা তাঁর প্রিয় ভগবানকে ডেকে আরও বলছেন—"ভগবান এক নিদারুণ দুঃখের মুহূর্তে তোমায় আমি বলেছি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—তাইতো তুমি এলে তোমার মহিমায়।" তারপরে তাঁর ভগবানকে আকুতি করে তিনি বলছেন—"ভগবান তোমার কথা আমি শুনছি, মানছি—তুমি আমার দরজা খুলে দিয়েছ, চোখ খুলে ধরেছ—অন্ধকার দূর করেছ।"

দীর্ঘ ছয় বছর একান্তে নির্জনে অবিরাম অনন্ত সাধনায় মায়ের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়েছে—পূর্ণ চেতনায় পূর্ণ উপলব্ধিতে মা এখন সমৃদ্ধ—নির্জনবাসের অত্যুগ্র সাধনা অন্তে মা এখন ফিরে এসেছেন পূর্ণ শক্তি ও পরা চেতনা নিয়ে তাঁর পরম গুরু, তাঁর ইষ্ট শ্রীঅরবিন্দের

সান্নিধ্যে, তাঁরই অভিষ্ট কাজে আত্মনিয়োগের জন্যে। গুরুর সান্নিধ্যে আরও ছয় বছর কঠোর একাগ্র সাধনায় ও নিষ্কাম কর্মে মা পূর্ণ জ্ঞানে ও অতিমানস আলোকে সঞ্জীবিত হলেন। শ্রীঅরবিন্দ এই সময় অধিমানস শক্তি নামিয়ে এনে অতিমানসের গভীরতম সাধনায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন—মাকেই তিনি ভার দিলেন আশ্রম ও ভক্তশিষ্যদের সাধনা পরিচালনার—যার জন্য মায়ের এত বৎসরের প্রস্তুতি। তাঁর নিপুণ পরিচালনায় আশ্রম প্রাণবন্ত হয়ে উঠ্‌ল—সকলের সাধনা এগিয়ে চলল সক্রিয়ভাবে। দীর্ঘ চব্বিশ বছর একদিকে অন্তরালে শ্রীঅরবিন্দের গভীরতম সাধনা—অন্যদিকে মায়ের একনিষ্ঠ সাধনা ও কর্ম অব্যাহত ভাবে এগিয়ে চলে—অভিনব পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও গবেষণাও চলতে থাকে নানা অধ্যাত্ম বিষয়ে—শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও চেতনা উঠেছে কোন্ উর্ধ্বস্তরে—যার প্রমাণ স্বরূপ, আশ্রমে ঘটতে থাকে বহু ঘটনা, যাতে করে উচ্চ শক্তির অবতরণের আভাস ও ইঙ্গিত পেতে থাকেন আশ্রমবাসী সকলেই। এমনই অবস্থায় ১৯৫০ সনের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে শ্রীঅরবিন্দ অতিমানস চেতনাকে অবতরণ করালেন নিজের দেহে—তা তিনি নামিয়ে দেবেন পৃথিবীর মাটিতে—মানুষের রূপান্তর ঘটানর পরম যোগে—কিন্তু পৃথিবী প্রস্তুত নয়, মাটির গ্রহিষ্ণুতার অভাব তখনও—ফলে মহাযোগেশ্বর মহাদেব শ্রীঅরবিন্দ সেই শক্তি নিজদেহে ধারণ করে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে হলেন মৃত্যুঞ্জয়ী ভগবান—পৃথিবীর মাটিতে অতিমানসের সম্পূর্ণ প্রকাশ স্থায়ী করার ভার দিয়ে গেলেন শ্রীমায়ের ওপর।

আশ্রম গভীর শোকমগ্ন, বাক্য-হারা—সবাই চেয়ে রইলেন শ্রীমায়ের মুখ পানে—সে মুখ গম্ভীর আনত, অভিভূত—কিন্তু অতিমানস জ্যোতিঃ ততক্ষণে শ্রীঅরবিন্দের দেহ হতে মায়ের দেহে সঞ্চারিত হয়েছে, আশ্রয় পেয়েছে সেখানে—অতিমানস চেতনায় মা বলীয়ান হয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠ শুনলেন মা—তিনি আশ্বাস দিলেন মাকে—তাঁর আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ থাকবেন তাঁদের মধ্যে পৃথিবীর আবহাওয়ায়। শ্রীমায়ের তখন আরম্ভ হ'ল এক উত্তুঙ্গ সাধনা—সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল আশ্রমেরও সকল কাজ—সেও এক সাধনা—পৃথিবীর বুকে অতিমানসের পূর্ণস্থিতির জন্য বিরাট যোগ তপস্যা। পূর্বেই, মা অতিমানস চেতনার অবতরণের ধারণ সামর্থ অর্জন করেছেন—এখন তা নামিয়ে আনলেন পৃথিবীর মাটিতে ১৯৫৬ সনে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি তাঁর পরম গুরুকে জানালেন—

"এক নূতন আলো ফুটে উঠেছে,
এক নূতন জগৎ জন্ম নিয়েছে।
তিনি যা চেয়েছেন তা সম্পন্ন হয়েছে"॥

অতিমানস জগতে স্থায়ী হ'ল--মায়ের চেতনা এখন এক নূতন শক্তিতে শক্তিমান—অতিমানস জ্যোতিঃ মায়ের দেহ আশ্রয় করে রয়েছে—মা দেখছেন তাঁর দেহ হয়ে উঠেছে বিরাট—রং তার নিকষ কাঞ্চন—মা মানুষের নবজীবনে উত্তরণের স্বর্ণদুয়ার খুলে ধরলেন।

মীরা মা এগিয়ে চলেছেন তাঁর আরব্ধ কাজের সার্থকতার সাধনায়—ভগবানকে তাই তিনি ডেকে বলছেন—

"আমাদের অন্তরের কোন-কিছুই যেন তোমার কর্মের অন্তরায় না হয়;
কোন কিছুই যেন তোমার আবির্ভাবে বিলম্ব না ঘটায়!
তোমার ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয় প্রত্যেক জিনিসে, প্রত্যেক মুহূর্তে।"

মা তাঁর পরম গুরুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন—সেই সঙ্গে মায়ের চেতনায় ধ্বনিত হচ্ছে তাঁর মধুরতম ভগবানের বাণী—

"সমস্ত জগত হয়ে উঠবে তোমার সৃষ্টি,
তোমার কর্মের ক্ষেত্র, তোমার বিজয় গৌরব ॥"

মা এক পায়ের আর এক পা, তারপরে আর এক পা—আবার তারও পরে আর এক পা করে নিরন্তর এগিয়ে চলেছেন—মানুষকে দিব্যজীবনের পথে পৌছে দিতে—এই পদযাত্রায় তিনি এসে পৌছিলেন মানুষের অদূর ভবিষ্যতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম সাধনা ও ঐক্যের পীঠস্থান ভোরের নগরী, ভবিষ্যতের নগরী অরোভিল রূপায়িণের স্বর্ণদুয়ারে।

এ মায়ের নবতম ও অভিনব সৃষ্টি—এরই মধ্যে এই কর্মযজ্ঞে জগতের বহুরাষ্ট্র এগিয়ে এসেছে অকুণ্ঠ সাহায্য ভাণ্ডার নিয়ে—দেশ বিদেশ হতে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এগিয়ে এসেছে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে—এই যজ্ঞের পূর্ণ সফলতার জন্যে। নিখিল বিশ্ব এক হতে চলেছে—পৃথিবীর পরিধি মা ছোট করে এনেছেন—পৃথিবীর মানব গোষ্ঠীকে মা একসূত্রে বাঁধতে চলেছেন ঐক্যের বাধনে—আদর্শনিষ্ট স্বার্থত্যাগী মানুষের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। এখানে মাতৃমন্দির গড়ে উঠছে মানুষের ঐক্য, শান্তি, পরাজ্ঞান ও তপস্যার প্রতীক হয়ে।

মায়ের কর্মক্ষেত্র, ক্ষেত্র হতে ক্ষেত্রান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে বিস্তৃত হয়ে চলেছে—জীবনের প্রতিক্ষেত্রকে তা বিভাবিত করছে। এই দেশের সীমানা পার হয়ে তা পৌছেছে পৃথিবীর নানা দেশের পল্লী ও নগরীতে—শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের ভাবধারায় ও দর্শনে মানুষ পথের দিশা পেয়েছে—হতাশা দূর হয়েছে।

জগতের মানুষ আজ জীবনের নূতন মূল্যায়ণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে—সেই পথযাত্রায় তারা শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের দর্শন ও ভাবধারায় আশার আলোকের প্রতিফলন লক্ষ্য করেছে। পৃথিবীর দেশে দেশে তাই গড়ে উঠছে শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির শাখাকেন্দ্র সমূহ—প্রচার ও গবেষণা চলছে সর্বত্রই। নানাদেশের মানুষ অনুশীলন

করছে শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের অন্তর্নিহিত ভাব ও অর্থের—জগদব্যাপী অশান্তি ও অসাম্যের ভিতরে শ্রীঅরবিন্দের প্রদর্শিত পথই যে একমাত্র বাঁচবার পথ একথা উপলব্ধি করেছে চেতনশীল মানুষ—তাই আজ এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের গবেষণা ও অনুশীলন চলছে নিরন্তর—কিভাবে ঐ ভাবধারা ও দর্শন মানব জীবনে বাস্তবে রূপায়ণ করা যায় তারই জন্যে। তাই জাতিপুঞ্জের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা জগতের মানুষকে শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে তার নিজের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। শ্রীমায়ের যৌবনে, বাহা সম্প্রদায়ের নেতা আবদুল বাহাকে মা যে কথা বলেছেন—"আমার লক্ষ্য অর্ধেক প্যারিস নয়—সমগ্র পৃথিবী"—তাই আজ বর্ণে বর্ণে সত্য হয়ে উঠেছে।

আজ ব্যষ্টি মানবকে তার পথ বেছে নিতে হবে—অমৃত না মৃত্যু, আনন্দ না দুঃখ, আলো না অন্ধকার। নির্ভয়ে অভিষ্টে এগিয়ে চলতে হলে সঙ্কীর্ণতার উর্ধে উঠতে হবে—চেতনাকে প্রশস্ত করতে হবে—আর সবার উপরে পরা শক্তি জগন্মাতা মাকে জানতে হবে।

১৫

মহাসমাধি

"হে অমর আত্মা! জেগে ওঠ তুমি,
জয় কর কাল আর মৃত্যু।"

—সাবিত্রী

মায়ের কর্মযজ্ঞের সাথে সাথে তার রূপান্তরের কাজও বেড়ে চলেছে, তাঁর সাধনা আজ তুঙ্গে—অধিকাংশ সময়ই মা এখন অন্তর্মূখীন —আস্তে আস্তে বাহিরের কাজ কমিয়েই আনতে থাকেন মা—কিন্তু মা তাঁর চারপাশের সব কিছু হ'তে নিজেকে সরিয়ে রাখেননি এখনও এবং নিজের দেহকেও বাহিরের ঘাত প্রতিঘাত হ'তে সংরক্ষিতও করেননি—তিনি মাটির সঙ্গে নিজের চেতনাকে এমনভাবে একীভূত করেছিলেন যে প্রত্যেক বড় বড় ঘটনা এসময় তাঁর দেহতে চিহ্ন এঁকে দিত—পৃথিবীকে তার সব দুঃখ হ'তে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে তিনি নিজে সকল কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করতেন। শ্রীঅরবিন্দ সেই কোন কালে তাঁকেই উদ্দেশ ক'রে সাবিত্রি মহাকাব্যে বলেছেন—"পৃথিবীর ভার অপনোদনকারীকে সেই কষ্ট ও যন্ত্রণার ভার সহ্য করতেই হবে।" সকলেই জানতেন যে রূপান্তরণের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মা তাঁর জীবনকে ধরে রাখবেন—কিন্তু এ সম্বন্ধে সব সন্দেহের নিরসন ক'রে দশ বছর পূর্বেই মা বলেছিলেন—"গতানুগতিক সাধারণ পথে যে দেহের জন্ম হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই তার শেষ হবে।" সেই সঙ্গে নিজের সম্বন্ধেও বলেছিলেন—"দুটি ধারার মধ্যে এখন প্রতিযোগীতা চলছে: রূপান্তরের কাজের শক্তির ও বয়স বৃদ্ধির পদ্ধতির মধ্যে।" সবাই আশা করেছিলেন যে তিনি, তাঁর জীবনকে দীর্ঘস্থায়ীই করবেন—কিন্তু ভগবানের লীলা অনুধাবন করা মানুষের অসাধ্য।

কিছুকাল থেকেই মা তাঁর আলোকোজ্জ্বল সূক্ষ্মদেহ প্রস্তুত করছিলেন—ভবিষ্যতে তাঁর বাসস্থানের জন্য—আর এই জন্যই তিনি অন্তরালে যাবার জন্য আস্তে আস্তে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। অবশেষে মা ১৯৩৩ সনের মে মাসে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন—২১শে মে হ'তে তিনি বাহিরের কাজকর্ম ও দেখাশোনা একেবারেই বন্ধ ক'রে দিলেন।

অতিমানস জ্যোতিঃ, শক্তি ও চেতনা এখন মায়ের দেহ আশ্রয় ক'রে রয়েছে—মায়ের দেহ অতিমানস আলোকে উজ্জ্বলতম হয়ে উঠেছে—মা গভীর হতে গভীরতর গভীরতম সাধনায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস রূপান্তরণের গভীরতম সাধনা চলতে থাকে—সকল দর্শন, সকল কর্ম হ'তে মা এখন একেবারে বিযুক্ত—কিন্তু দর্শন বন্ধ থাকলেও মা আছেন সবারই অন্তরে —মাকে পাওয়া এসময় আরও সহজ, আরও অনায়াস লভ্য হয়ে উঠেছে—সমস্ত অন্তর দিয়ে ডাকলে মাকে অনুভব করা যায়—দেখাও যায়—আশ্রমের সকল কাজও কোন্ অদৃশ্য হস্ত ঠিকভাবেই সম্পন্ন করিয়ে নেয়।

১৯৩৩ এর ১৫ই আগষ্টের দর্শনের আর দেরী নেই—হাজার হাজার মানুষ আসতে আরম্ভ করেছে পণ্ডিচেরীতে—এবারের দর্শনার্থী যেন দশগুণ বেড়ে গেছে—সবারই এক কথা মা তো অন্তরালে—মা কি দর্শন দেবেন ?—মা যে গভীরতম তপস্যায় ডুবে আছেন—সমাধি মগ্ন। মায়ের যাঁরা দেখা শোনা করেন—আশ্রম সম্পাদক, কেউই জানেন না মা দর্শন দেবেন কিনা ? ১৪ই বিকালে সমাধি ভঙ্গে মা জিজ্ঞাসা করলেন কত তারিখ ? জানান হ'ল পরদিন দর্শন—মা বললেন ১৫ই সন্ধ্যা ৬-:৫ মিঃ এ মা অনুরক্ত ভক্তজনকে দর্শন দেবেন। পরদিন খবর ছড়িয়ে পড়ল—সকাল থেকেই নীচের রাস্তায় ভক্ত দর্শনার্থীরা নিজের নিজের জায়গা ক'রে নিতে থাকেন—বিকালে বিশাল জনসমুদ্র অধীর আগ্রহে মাকে দেখার জন্য ব্যাকুল। অবিশ্রান্ত বারিপাতের

মধ্যেও সকলে স্থির শান্তভাবে অপেক্ষমান—শিশুরাও ভগবদ্-দর্শনের অনুভূতির জন্য নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এমনি সময়ে মা এসে দাঁড়ালেন —আস্তে আস্তে উপরের বারান্দার একদিক হতে অপর দিকে চললেন —চাইতে চাইতে—মুখে সেই ভুবনমোহিনী হাসি—সবার দিকেই চাইলেন—যেমন অভ্রভেদী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন—তৃপ্ত হ'ল অগণিত মানুষের মন প্রাণ—ভরে উঠ্ল তাদের অন্তর মায়ের স্নেহ দৃষ্টি স্পর্শে। কিন্তু কেউ-ই সেদিন জানেনা যে এই পৃথিবীতে এই তাদের শেষ দেবীদর্শন।

নভেম্বর মাসের ৯ তারিখ পর্যন্ত মায়ের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ধারা অব্যাহতই রইল—এখন খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধই করেছেন মা— পরিচর্যাকারীরা কোনমতে একটু দুধ ও ফলের রস খাওয়াতে পারছেন। ১০ই নভেম্বর হতে মায়ের শরীরের অবস্থার অবনতি হ'তে থাকল— ১৩ই রাত্রি দশটায় মা বললেন তাঁকে উঠিয়ে বসিয়ে দিতে—তাঁর কথামত তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হ'ল—ভোর ৪টায় মা একটু ঘুমালেন। ১৪ তারিখে অবস্থা আবার স্বাভাবিক বোধ হ'ল—এদিন কিছু খাদ্যও মা গ্রহণ করলেন—রাত ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত মা ঘুমালেনও। ১৫ তারিখ নির্বিঘ্নেই কাটল—মা এইদিন একটু বেশী খেলেন। ১৬ তারিখও ভালভাবেই কাট্‌ল। ১৭ই নভেম্বর সকালে ভালভাবেই প্রাতঃরাশ গ্রহণ করলেন মা—দুপুরেও খেলেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় মা বললেন তাঁকে উঠিয়ে বসিয়ে দিতে। কুমুদ জিজ্ঞাসা করলেন মা কি কয়েক চামচ গ্লুকোজ জল খাবেন? মা তাকে বললেন পুরোপুরি সোজা করে বসিয়ে দাও—তাই দেওয়া হ'ল। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ডাক্তার সান্যাল এসে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন নাড়ির গতি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হচ্ছে—মাঝে মধ্যে তা আবার অনুভূতই হচ্ছে না—তখনও শ্বাস প্রশ্বাস কিছু অনুভূত হচ্ছিল—সন্ধ্যা ৭-২৫ মিনিটের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিলেন মা—আর একবার—তারপরে আর শ্বাস গ্রহণ করলেন না মা। তখন ঘড়িতে ঠিক ৭টা বেজে ২৫ মিনিট। মায়ের

নিজেরই রচিত আলোকজ্বল সূক্ষ্ম দেহতেই বোধ হয় আশ্রয় নিলেন মা—আরও নিবিড়ভাবে আরও প্রজ্বলন্তরূপে মানুষের সাধনা—অতিমানস স্তরে পৌঁছে দেবার মানসে। রাত্রি ১১টায় নলিনী বললেন—"মা বলেছিলেন যদি কোন সময় মনে হয় আমার দেহে জীবন নেই—তাহলে যেন তৎক্ষণাৎ কিছু না করা হয়—তাঁর দেহ যেন সুরক্ষিতই থাকে।"

রাত্রি দুটায় মায়ের দেহ ধ্যান ঘরে নামিয়ে নিয়ে আসা হ'ল, রাখা হ'ল সেখানে শ্রীঅরবিন্দের প্রতীকের সামনে ভক্ত মুমুক্ষু-জনের দর্শনের জন্য। নলিনী বললেন, মা এক সময় বলেছিলেন—"যদি কখনও আমি দেহ ত্যাগ করি—আমার চেতনা তোমাতে বর্তাবে—মা আমাদের মধ্যেই আছেন—তাঁর কাজও চলছে।" রাত্রি ৩টা হ'তে আশ্রমের বিশিষ্ট ভক্তজন এসে মায়ের আলোকোজ্বল স্বর্ণ দেহের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে থাকেন—কেউ কেউ ধ্যানে মাকে দেখলেনও সেই রাত্রে। ভোর ৪-১৫ মিনিটের সময় আশ্রমের সদর দরজা খুলে দেওয়া হ'ল।

১৮ই নভেম্বর ১৯৭৩ সকালে জগৎবাসী সকলে স্তব্ধ নিঃশ্বাসে শুনলেন আকাশ বাণীর সংবাদ—"শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীমা ১৭ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৭-২৫ মিনিটের সময় মহাসমাধি লাভ করেছেন—তাঁর মরদেহ যতদিন অবিকৃত থাকবে ততদিন ভক্ত শিষ্য মুমুক্ষু জনগণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সযত্নে রক্ষিত হবে।" এই সংবাদ শোনামাত্র সকল দেশের হাজার হাজার শোকে মুহ্যমান মানুষ যাত্রা করলেন পণ্ডিচেরী অভিমুখে মায়ের শেষ দর্শনের অভিলাষে। পণ্ডিচেরীতে ভোর হতেই হাজার হাজার নরনারী এসে তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানাতে থাকেন—এত যে জন সমাগম—কিন্তু সকলেই শৃঙ্খলা পরায়ণ—যেমনটি ঠিক মা পছন্দ করেন—সকলেই মৌন স্থির—শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে মায়ের আশীর্বাদে ধন্য হওয়ার বোধ নিয়ে ঘরে ফেরেন—যেমনটি ঠিক হ'ত তাঁর দেহে অবস্থানকালে। পণ্ডিচেরীর রাজ্যপাল

শ্রীহেমন্দিলাল নিজে এসে মায়ের পদতলে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে ধন্য হলেন, বললেন—"মা দিব্য চেতনার প্রতীক—দেহে না থাকলেও মায়ের আত্মা যুগে যুগে মানুষকে শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম আদর্শ অনুসরণের পথ দেখাবেন।"

ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীভি ভি গিরি তাঁর শোক বার্তায় বললেন—"অধ্যাত্ম জগতের পথ প্রদর্শিকারূপে ও শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তাঁর জীবন ও কর্মের জন্য তিনি মানুষের হৃদয়ে চিরজীবী হয়ে থাকবেন।"

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গভীর শোকে অভিভূত হয়ে বললেন—

"মায়ের তিরোধানে আমি গভীরভাবে শোকার্ত—তাঁকে নিবিড়-ভাবে জানার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল—এতদিন তিনি যে আমাদেরই মধ্যে ছিলেন তা-ও আমাদের সৌভাগ্য। তাঁর বাণী এখনও আমাদের প্রেরণা যোগাবে।

মা ছিলেন অভূতপূর্ব চরিত্রবলে বলীয়ান ও অধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্না—আশ্রম পরিচালনায়, সমাজ কল্যাণে এবং অরোভিল সৃষ্টিতে তাঁর অনন্য জ্ঞান ও বাস্তবধর্মী সৃজনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নবীনের শক্তি, আধুনিক মন এবং অধ্যাত্ম বিষয়ে ভারতের মহত্ব সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন এবং ভারতই যে পৃথিবীর মানুষের নূতন অধ্যাত্ম চেতনার পথ প্রদর্শক হবে, ভারতের এই ভূমিকার বিষয়েও তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল।"

বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ও সর্বশ্রেণীর মনিষীগণও তাঁদের শ্রদ্ধা জানালেন মায়ের প্রতি। ২০[illegible] নভেম্বর মঙ্গলবার, সকাল ৮-২০ মিনিটে মায়ের অতিমানস দে[illegible]রা হ'ল গোলাপ কাঠের বাক্সে যা আগে থেকেই প্র[illegible]বাক্সের ভিতরে পাতা ছিল রূপার পাত—তার উপ[illegible]বটাই প্রস্তুত করেছেন আশ্রমবাসী ভক্তজন—বাক্স বা[illegible]া হ'ল।

ঐ বাক্সের উপরে খাঁটি সোনার মায়ের প্রতীক এঁটে দেওয়া হ'ল।

মহাসমাধি কোথায় হবে এ প্রশ্নেরও তো মা-ই সমাধান করে রেখেছেন শ্রীঅরবিন্দের মহাসমাধির সময়ে সেই ১৯৫০ সনে। শ্রীঅরবিন্দ মা এক—তাঁদের চেতনা এক—তাঁদের সাধনা এক—শিব ও শক্তি অভেদ—একই ব্রহ্মের দুইরূপ—নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়। শ্রীঅরবিন্দের মহাসমাধি ক্ষেত্রেই শ্রীঅরবিন্দের কংক্রীটের ঘরের উপরেই মায়েরও ঘর প্রস্তুত ছিল, সেখানেই স্থাপনা করা হ'ল মায়ের স্বর্ণ দেহ। নলিনী ও আঁদ্রে তারপরে গোলাপের পাপড়ির শ্রদ্ধাঞ্জলী ঢেলে ভরিয়ে দিলেন ঐ বাক্সের উপরিভাগ এবং তারপরে সেই ঘরের কংক্রিটের ছাদ ঢাকা হ'ল—উপস্থিত ভক্তজন সকলে এক এক মুঠো বালি নিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা অর্ঘ দিয়ে পুরিয়ে দিলেন সেই মহাসমাধি। তারপরে দশ মিনিট সবাই ধ্যানে মগ্ন হলেন। অনেকেরই কিছু কিছু অনুভূতি লাভ হ'ল—কেউ কেউ শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমায়ের যুগ্ম উপস্থিতিও অনুভব করলেন নিজ নিজ অন্তরে—আশ্বস্ত হয়ে ফিরলেন তাঁরা শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমা আছেন এই বোধ নিয়ে—এই শাশ্বত উপলব্ধি নিয়ে। এ বিষয়ে ললিতার অভিজ্ঞতা আরও বিস্ময়কর। ২০শে নভেম্বর ভোর রাত্রে ১টা থেকে ২টার মধ্যে ললিতা মাকে আর্তি করে বলছেন—"প্রিয়তমা মা! ভগ্ন হৃদয়ে অত্যন্ত পীড়িত হয়েই তোমার কাছে এসেছিলাম। আজ এই ঘটনায় কি ভগবানেরই পরাজয় ঘটল? যখন আমরা রূপান্তরের প্রত্যাশা করছি তখন তুমি দেহ পরিত্যাগ করলে কেন? আমার সমস্ত আশা ভরসা তোমাকেই কেন্দ্র করে ছিল।" এর পরে তিনি বলছেন—"আমি মায়ের দেহের সমনে বসে ধ্যান ঘরে নীরবে কাঁদছি এমন সময় আমি এক প্রবল শক্তি অনুভব করলাম যেন তা আমাকে ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—যা আমাকে সময় ও স্থান কাল সবই ভুলিয়ে দিল। এমন সময় মা যেন পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে এলেন। ঈষৎ স্বর্ণাভ পরিচ্ছদে তাঁর অঙ্গ ঢাকা—বিচ্ছুরিত হচ্ছে উজ্জ্বল সাদা আলো তাঁর সারা দেহ হতে। মা

হাসলেন, সেই মিষ্টি হাসি—বললেন—'এ দিব্যের পরাজয় নয়—এও জয়েরই সূচনা।' তারপর মা বললেন—'আমি তোমাদের ছেড়ে আসিনি—কখনও ছাড়বও না—অহং ভুলে যাও—সমন্বয়ের সঙ্গে বাস কর ও কাজ কর ভগবানেরই জন্য—বিজয়ের আর দেরী নেই।"

শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের সমাধিক্ষেত্র শুধু যে তাঁদের দেহাবশেষের আধার তাই নয়—এ অধ্যাত্ম চেতনার ও শক্তির আশ্রয় স্থল—যেখান হতে বিকীর্ণ হচ্ছে অবিরাম স্পন্দন রশ্মি চারিদিকে। শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমার তপস্যা ও চেতনা বুকে ধরে সমাধি হয়ে উঠেছে আজ এক জীবন্ত সাধনার পীঠস্থান—এক সক্রিয় শক্তিশালী আধ্যাত্মিক কেন্দ্র—পৃথিবীতে এক অনবদ্য সুন্দব পুষ্পরাজি শোভিত, ধূপ-ধুনা গন্ধে আমোদিত স্বর্গীয় সাধন পীঠ—যার তুলনা পৃথিবীর কোথাও নেই।

শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমা অমর—তাঁরা আছেন আমাদের অন্তরে—যেমনটি ছিলেন তাঁদের দেহে অবস্থান কালে। তাঁদের চেতনা সর্বদা সর্বত্র রয়েছে আমাদের ঘিরে—এতটুকু গ্রহিষ্ণুতা থাকলে নিশ্চয়ই তা অনুভূত হবে—আমাদের দিক থেকে শুধু প্রয়োজন পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলা।

মা অমর—দেশ কালের সীমানা পার হয়ে আমাদের মা আসীন—মা ধারণ করে আছেন অতিমানসের শ্বেত-জ্যোতিঃশিখা—উজ্জ্বল আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে—এই মাকে আমরা চিনেছি, জেনেছি বিশ্বজননী, জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী-রূপে। মা বিরাট, মায়ের পরিমাপ হয় না—তবুও মা আমাদের সত্যকার মা-ই। মা আধারের ভিতরে বা বাহিরে যেখানেই থাকুন—একবার যে মায়ের আশ্রয় নিয়েছে—সে কাছে থাকুক আর দূরে থাকুক—তিনি ধরে আছেন তাকে—তিনি ধরে আছেন সকলকেই। মা দেবী, মা ভগবতী—আবার সব মিলিয়ে মা এক পরম বিস্ময়।

মা! তুমি আমাদের প্রণাম নাও, আন্তরিক শ্রদ্ধা নাও, আমাদের আন্তরিক সমর্পণ নাও—আমাদের যোগ্য ক'রে তোল—

আমাদের এগিয়ে নিয়ে চল—পথ আমাদের আলোকিত কর, বাধা বিঘ্ন অপসারিত কর—তোমার মহান ত্যাগ ও আদর্শ অনুসরণ করার শক্তি দাও—এক সর্বজয়ী আস্পৃহার অগ্নি আমাদের অন্তরে প্রজ্বলিত কর—সর্বাঙ্গীন সার্থকতায় আমাদের অন্তর ভরিয়ে দাও—তোমার চরণে আভূমি প্রণত হয়ে সবার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি—

"আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী সত্যময়ী পরমে ।
আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী সত্যময়ী পরমে ॥
আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী সত্যময়ী পরমে !!!'

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদারের

শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের জীবনী, ভাবধারা ও সাধনার অনন্য পুস্তকাবলী

ঋষি অরবিন্দের যোগ জীবন ও সাধনা : (তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ)

শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণাঙ্গ জীবনী ও সাধন প্রণালী। সহজ সরল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় লেখা—ভাবে ভাষায় অনবদ্য।

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা—একটী উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত—বইটী স্থলিখিত ও চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি—শ্রীঅরবিন্দকে আমাদের বুদ্ধি ও অনুভূতির সীমানায় এনে গ্রন্থকার তাঁর বিপুলতার আভাস দিয়েছেন। মূল্য : দশ টাকা।

শ্রীমায়ের দিব্য-জীবন ও সাধনা : (তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ)

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা—শ্রীমজুমদার একটী সুসম ও সুসীম চিত্র দিয়েছেন যা শুধু অভিনব অসীমতার আভাষ দেয় না, পরন্তু, পরপর মায়ের স্বরূপকে বোঝবার, জানবার ও জানবার চেষ্টা করে।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত—শতবার্ষিকী বৎসরের একখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

মূল্য : নয় টাকা।

শ্রীমায়ের সাধনার রূপরেখা : (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সাধক কিভাবে জীবনে সাধন পথে অগ্রসর হবেন শ্রীমা কর্তৃক তার বাস্তব পথ নির্দেশ। যোগের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য এ এক অপূর্ব গ্রন্থ।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত—"মায়ের সম্বন্ধে যারা ভিতর থেকে কিছু জানতে চায় এ বই তাদের অনেক খানি সাহায্য করবে। মূল্য : ছয় টাকা।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনার রূপরেখা :

শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় অগ্রসর হওয়ার বাস্তব পথ নির্দেশ, সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা। সাধন সংক্রান্ত দুরূহ বিষয়াবলীও সহজ ভাষায় সহজবোধ্য ও সকলের উপযোগী করে লেখা একখানি অনবদ্য গ্রন্থ। মূল্য ছয় টাকা।

শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমায়ের লেখা হ'তে সঙ্কলিত শতবার্ষিকী পুস্তিকা মালা হ'তে এই গ্রন্থকার কর্তৃক অনূদিত পুস্তিকাসমূহ :

নিদ্রা ও স্বপ্ন : মূল্য দুই টাকা ;
মৃত্যু : " দুই টাকা ;
পুনর্জন্ম : " দুই টাকা।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ

ঋষি অরবিন্দের যোগ জীবন ও সাধনা (৩য় সং)

শ্রীমায়ের সাধনার রূপরেখা (২য় সং)

শ্রীঅরবিন্দের সাধনার রূপরেখা

শ্রীঅরবিন্দ জীবন আলেখ্য

শ্রীমা জীবন আলেখ্য

সাবিত্রী আলেখ্য

ভগবান রমণ মহর্ষি (২য় স

প্রার্থনা ও সমর্পণ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ জীবন আলেখ্য (যন্ত্রস্থ)